শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রাপ্তিস্থান

ইস্টার্ণ-ল হাউস

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ :: শ্রাবণ ১৩৪৭

দাম আট আনা।

আরতি এজেন্সি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে
শ্রীঅনাথনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৫০ নং পটলডাঙ্গা
ষ্ট্রীট বী প্রেস হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
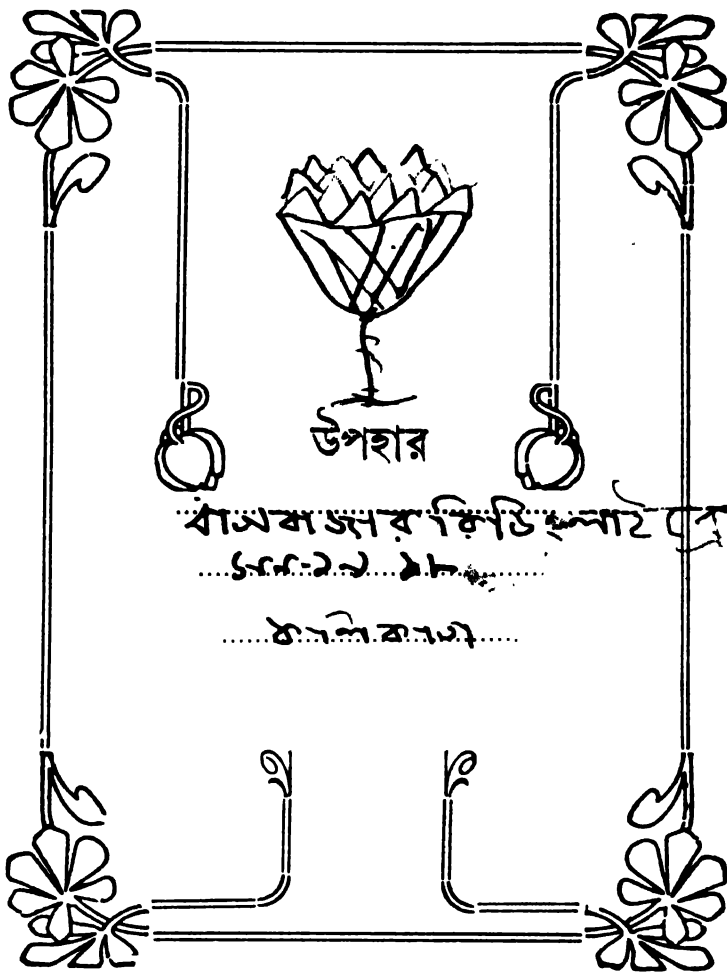
আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

পাঁচ আনা সিরিজ

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

বেজায় হাসি (কবিতার বই)

ছয় আনা সিরিজ

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

লালন ফকিরের ভিটে

গুজবের জন্ম

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মণ্টুর মাষ্টার

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

জীবনের সাফল্য

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

মায়াপুরীর ভূত

বুদ্ধির লড়াই

পরীর গল্প

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্প ঠাকুরদা

এক পেয়ালা চা

ছয় আনা সিরিজ

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

নীতি গল্প গুচ্ছ

জাতকের গল্প-মঞ্জুষা

গল্পবীথি

গল্পবেণু

অঞ্জলি

শিশু সারথি

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

খাদে ডাকাতি

শ্রীসুকুমার দে সরকার

অরণ্য রহস্য

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

অচিন দেশের রাজকন্যা

আট আনা সিরিজ

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

কায়াহীনের প্রতিশোধ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কল্পলোকের কথা

আট আনা সিরিজ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মড়ার মৃত্যু

আজবদেশে অমলা

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

কালগ্রাসে কাল যবন

দশ আনা সিরিজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার পাহাড় (উপন্যাস)

মায়ের গৌরব ঐ

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

বলতো (ধাঁধার বই)

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রাজার ছেলে (উপন্যাস)

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

পাতালপুরের আংটি (উপন্যাস)

বার আনা সিরিজ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষ পিশাচ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্যোমদাসের মাতুলি

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত—ছোটদের বার্ষিকী

আরতি

সব রকম গল্প, কবিতা, কাহিনী, নাটক প্রভৃতির সংগ্রহ, সমস্ত লেখাই মৌলিক

৪৫০ পাতার বিশাল বই **দাম ১।০ আনা।**

হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেলো।

ড্রাইভার তার নিজের কোন দরকারে থামিয়েছে মনে ক'রে আমরা প্রথমটায় কিছু খেয়ালই করলুম না ; কিন্তু একটু পরেই সন্দেহ হ'লো যে কল বিগড়েছে।

সন্তোষ গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁক দিলে—'ড্রাইভার, কী হ'লো?'

—'আজ্ঞে দেখছি,' ব'লে সবুজ মাফলার জড়ানো ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে পড়লো। গাড়ির বনেট খুলে এটা দেখলো, ওটা দেখলো, ; নিজের গদির তলা থেকে দু'-একটা যন্ত্রপাতি বা'র ক'রে ঠুকঠাক শব্দ করলে ; আবার বনেট চাপা দিয়ে ষ্টিয়ারিং হুইল ধরল—গাড়িটা যেন দায়ে প'ড়ে অস্ফুট গোঁ-গোঁ আওয়াজ ক'রে উঠল, কিন্তু চল্‌ল না।

ড্রাইভার বল্‌লে—'আজ্ঞে মনে হচ্ছে যেন অ্যাক্স্‌ল্ ভেঙ্গে গেছে।'

—'তোমার মুণ্ডু ভেঙ্গেছে'! সন্তোষ তম্বি ক'রে উঠলো, 'যেমন ক'রে পারো এক্ষুণি সারিয়ে নাও'।

ড্রাইভার আবার নামলো, চিৎ হয়ে গাড়ির তলায় ঢুকে চুপ ক'রে শুয়েই রইলো না কী করলো ঈশ্বর জানেন, কিন্তু গাড়ি তো আর নড়ে না।

এ ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। ঘড়িতে চারটে। ভরা শীতের বেলা, সন্ধ্যে হ'তে আর কতক্ষণ? তিন বন্ধু মিলে সকালবেলা রাঁচি থেকে বেরিয়েছি, এত কাছে এসে হাজারিবাগ না দেখে কি ফেরা যায়? তা হাজারিবাগ তো দেখলুম সকাল-বেলা খবরের কাগজ পড়ার মত, কোনো রকমে চোখ বুলোনো। বেলা না পড়তেই আবার ফিরতি পথে দৌড়, আর মাঝামাঝি রাস্তা এসে এই কাণ্ড।

ব'লে রাখা ভালো, আমরা বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে কোন খাবার আনি নি। ফ্লাস্কে ক'রে যে চা এনেছিলুম তা আসবার পথেই এক চুমুক দু' চুমুক করে ফুরিয়েছে। হাজারি-বাগে অনেক খুঁজে খুঁজে পার্ক হোটেল নামে যে বাঙ্গালীর হোটেল পাওয়া গেলো, তার খাদ্য নাক-চোখ বুজে উদরে চালান ক'রেও যে আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, সেটা নিশ্চয়ই হাজারিবাগের হাওয়ারই গুণ। রাঁচির দিকে আবার রওনা হ'তে-হ'তেই আমরা তিন জনেই বেশ ক্ষিদে টের পাচ্ছিলুম, এবং কতক্ষণে রাঁচি পৌঁছে বেশ ভালো রকম খাবো, এ ছাড়া আর কোন ভাবনা আমাদের ছিল না। এরই মধ্যে গাড়ি বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় মেজাজটা ঠিক খুশি হ'য়ে উঠলো না, তা তো বুঝতেই পারছো।

সন্তোষ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—'যেমন করে পারো আমাদের সন্ধ্যের আগে পৌঁছিয়ে দিতেই হবে। নয়তো পয়সা পাবে না।'

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে—'অ্যাক্স্‌ল্‌ ভেঙে গেছে তো আমি কী করবো? রামগড়ে পৌঁছতে পারলে টেলিফোন ক'রে দোস্‌রা গাড়ি আনানো যায়।'

সন্তোষ আরো কী কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলো, অশোক তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'ওর সঙ্গে চোটপাট ক'রে এখন কী হবে? কী কর্‌বে তা-ই ঠিক করো।'

আমি বললুম—'আপাততঃ এই মোটররূপী খাঁচা থেকে নামা যাক্‌ তো। পা দুটো ধরে গেছে।'

নামলুম তিন জনে গাড়ি থেকে। দু'দিকে বন আর উঁচু-নিচু মাঠ, মাঝখান দিয়ে চমৎকার চওড়া রাস্তা—ঢেউ-খেলানো। কী শান্ত, চুপচাপ সব! দু'জন-একজন ক'রে দেহাতি লোক চলেছে; দূরের গাছপালা শীতের পড়ন্ত রোদ্দুরে মনে হচ্ছে সবুজে সোনায়

পটে আঁকা। আমরা এদিক্-ওদিক্ দেখতেই বোঁ ক'রে একটা প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ি দারুণ বেগে রাঁচির দিকে চ'লে গেলো।

ট্যাক্সিওয়ালা বল্লে—'একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই বাস্ আসবে।'

সন্তোষ হুমকি দিয়ে উঠলো—বাসেই যদি যাবো তো তোমাকে এনেছিলুম কেন? ট্যাক্সি ঠিক করে দাও আর একটা।'

একটা লোক ছুটে এসে গাড়ীর সামনে ....

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালার কথায় বোঝা গেলো যে আর একটা ট্যাক্সি পেতে হ'লেও রামগড় পর্য্যন্ত যাওয়া দরকার। আরো ছ' মাইল দূরে রামগড়। কী ক'রে যাবো ছ' মাইল? হেঁটে।

ছ' মাইল হাঁটবার কথা ভাবতেই আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে এলো। বললুম—'চলো না, বাসেই উঠে পড়ি।'

—'হ্যাঃ, বাস্ তোমার ছুয়ারে প্রস্তুত কিনা! কখন্ আসে ঠিক কি? কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী হাওয়া খাবে?'

অশোক বল্‌লে—'আসবার সময় দেখেছি রামগড়ে চায়ের দোকান। সেখানে পৌঁছলে চা খেয়ে বাঁচবো তো! না হয় পৌঁছতে দেরিই হবে।'

ট্যাক্সিওয়ালা বল্‌লে, 'এক কাজ করুন বাবু, কতকগুলো লোক ঠিক করুন, গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।'

রাস্তার নীচে মাঠে দু'-একটা লোক কাজ করছিলো, ট্যাক্সিওয়ালা তাদের ডেকে আনলে। প্রথমে তারা রাজি হয় না, সন্তোষ বখ্‌শিসের কথা ব'লে, খানিক শাসিয়ে খানিক বুঝিয়ে রাজি করালে। দেখতে দেখতে প্রায় আট-দশ জন লোক জড়ো হ'য়ে গেলো। গরিব দেশ, পয়সার কথা বল্‌লে যে কোন কাজের লোক জোটে।

সন্তোষ বল্‌লে—'ঠ্যাল্‌ ব্যাটারা, ঠ্যাল্‌।'

যে লোকটা প্রথমে এসেছিলো, মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধা, ভীষণ ঢ্যাঙা আর ভীষণ কালো এক ছোক্‌রা, সে তার ঝক্‌ঝকে দাঁত বার ক'রে হেসে বল্‌লে, 'বখ্‌শিস্‌ মিলবে তো বাবু? বহুৎ মেহনৎ।'

—'মিলবে, মিলবে—যা।'

ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং হুইল ধ'রে ব'সে রইলো, আর ওরা হৈ-হৈ করতে করতে সেই উঁচু-নীচু রাস্তায় ঠেলে নিয়ে চললো গাড়ি। আমরা পিছন-পিছন হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু যত হাঁটি ততই হতাশ হই; যত এগোই ততই মনে হয় রামগড়ে আর কখনোই পৌঁছবো না, এদিকে বেলা পড়ে আসছে।

ইতিমধ্যে একটি রাঁচির বাস্‌ আমাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে গেছে। সন্তোষের কথা না শুনে যদি তখন বাসে যাওয়াই ঠিক করতুম! ওর গোঁয়ারতুমির জন্যেই তো এই দুর্ভোগ। থেকেথেকেই দু'-একখানা মোটর রাঁচির দিক যাচ্ছে আর আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে দেখছি।

শেষটায় একটা ট্যাক্সি আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাদের সামনে এসে থামলো ট্যাক্সিটায় লোক ছিলো, যাচ্ছিলো হাজারিবাগের দিকেই, কিন্তু হাজারিবাগ পর্য্যন্ত যাবে না। কাছাকাছি একটা জায়গায় সওয়ার নামিয়ে দিয়ে এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে।

বাঁচলুম।

ততক্ষণে আমরা দু' মাইল রাস্তা অন্ততঃ এসেছি। রামগড় তখনো ঢের দূর, হেঁটে যেতে হ'লে শীতের ঘুটঘুট্টি রাত্রে কী হ'তো কে জানে! গাড়ি ঠেলবার আর দরকার নেই, লোকগুলো খালাস পেয়ে পথের উপরেই ব'সে জিরুতে লাগলো।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিটা ফিরে এলো। লাফিয়ে উঠে বসলুম আমরা। অচল গাড়িটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেয়া হ'লো—রামগড়ে সে প'ড়ে থাকবে। যে লোক-গুলো গাড়ি ঠেলেছিলো, তারা উঠে গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ালো, কিন্তু গাড়ি তার আগেই ষ্টার্ট দিয়ে ফেলেছে।

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতে-ছুটতে বল্‌লে—'বাবু, বখশিস্, আমাদের বখশিস্?

আমি ব'লে উঠলুম, 'একটু থামো'।

কিন্তু সন্তোষ পকেট থেকে একটা দু'-আনি বা'র ক'রে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে—'এই নে, যা।'

আমি ব'লে উঠলুম, 'এ কী করলে—'

সন্তোষ আমার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, 'ঠিক হয়েছে'।

সেই পাগড়ি-বাঁধা ঢ্যাঙা লোকটা হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে—'বাবু, বহুৎ মেহনৎ—'

সন্তোষ বল্‌লে, 'ভাগো, ভাগো!' সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটলো পূরোদমে, কোথায় প'ড়ে রইলো ওরা। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, ওরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে আমাদের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো। বললুম—'কী করলে, সন্তোষ! মোটে দু' আনা দিলে! জন-পেছু একটা পয়সাও তো পড়লো না!'

সন্তোষ বল্‌লে—'আবার কী! সমস্ত দিন খেটে ওরা চারটে পয়সা হয়তো পায়। একটা আস্ত পয়সা কম হ'লো?'

—'এই চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে দু' মাইল রাস্তায় একটা গাড়ি ঠেলা—'

সন্তোষ বল্‌লে, 'পরে আর দুটো পয়সা দিলেই হ'তো। যাক্ গে।'

কিন্তু আমার মন থেকে ভাবনাটা গেলো না। কাজ হাসিল ক'রে নিয়ে এই নিরীহ লোকগুলোকে যেন স্রেফ ফাঁকি দিলুম। বড় ছোট লাগলো নিজেদের।

দ্যাখ্‌-না-দ্যাখ্‌ রামগড় এসে পৌঁছনো গেলো। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। এক ও-দিশি খৃষ্টান তার বাড়ির সামনের ঘরেই চায়ের দোকান করেছে। আহার্য্য বিশেষ কিছু নেই; কিন্তু চা-টা ভালো। শুকনো পাঁউরুটি সহযোগে সেই চা কী যে ভালো বলবার নয়। চা খেতে-খেতে আমি আবার বললুম—'সন্তোষ, তোমার হাতে দু' আনা উঠলো কী ব'লে!' অশোক আমার কথায় সায় দিল—'সত্যি! আমি তো ভেবেছিলুম অন্ততঃ দুটো টাকা দেবে।' সন্তোষ বল্‌লে, 'সময় পেলুম কোথায়? গাড়ি তো দৌড় দিলে।'

সন্তোষ বল্‌লে, 'তাড়াতাড়িতে পকেট থেকে যা উঠলো, তাই দিলুম। যাক্ গে, তোমরাও বড্ড বাড়াবাড়ি করছো।' সন্তোষ ও-কথা বল্‌লে বটে, কিন্তু বোঝা গেলো তারও মনের মধ্যে একটু খচ্‌ খচ্‌ করছে।

চা খাওয়া শেষ ক'রে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম। অচল গাড়িটা আর গাড়ির চালক রইলো রামগড়ে। অন্ধকার রাত্রিকে তীব্র হেড্‌-লাইটে দু' টুকরো ক'রে আমরা ছুটলুম রাঁচির দিকে। বেশ শীত, কম্বলে পা ঢেকে আমরা ঘন হ'য়ে বসেছি। কারো মুখে কথা নেই; তীব্র সবুজ আলোয় সামনের ঝোপঝাড় গাছপালা অদ্ভুত ছবির মত আমাদের চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে।

এই ষাট মাইল রাস্তার যেটুকু সব চেয়ে সুন্দর সেখানে পৌঁছনো গেলো। ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড়ে উঠে আবার নামতে হয়, তার খানিক পরেই রাঁচি। ঘুরে ঘুরে পথ চলেছে, কত অদ্ভুত মোড়, কত বিচিত্র বাঁক, আর দু'দিকে ঘন বন। আসবার সময় নীচে তাকিয়ে দেখেছিলুম, হাতে-আঁকা ছবির মত নীচে পৃথিবী প'ড়ে আছে। এখন অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, ঘন বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি নির্ভাবনায় ছুটেছে, এমন

সময় হঠাৎ কোথেকে একটা লোক ছুটে এসে গাড়ির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তিন জনে এক সঙ্গে দেখলুম, লোকটা ভীষণ ঢ্যাঙ্গা, ভীষণ কালো, আর তার মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা। ড্রাইভার 'হে—ই'! ব'লে ব্রেক ক'ষে দিলে, গাড়ি ক'রে থেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির আলো গেলো নিবে।

আমরা তো অবাক্! এত রাত্রে এই গভীর বনের মধ্যে লোক এলো কোথেকে! ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, লোকটা মরলো না কি! সন্তোষ হুকুম দিল—'ড্রাইভার, হেড্‌লাইট্‌স্।'

একটু পরে ড্রাইভারের জবাব এলো, 'হেড্‌লাইট্ জ্বলছে না।'

সন্তোষ চটে গিয়ে বল্‌লে, 'ব্যাটা মাতাল হয়েছিস্ নাকি? লোকটার কী হ'লো ছাখ্।'

ড্রাইভার বল্‌লে, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি নে।'

সন্তোষ আর এক পরদা গলা চড়িয়ে বল্‌লে—'গাড়ি চালাও।'

কিন্তু গাড়িও চলে না।

—'চালাও, চালাও,' সন্তোষ চীৎকার ক'রে বল্‌লে।

ড্রাইভার আরো অনেকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গাড়ি মোটে নড়েই না।

অন্ধকারে আমরা পরস্পরের মুখ দেখবার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে একটা টর্চ আনি নি, আর টর্চ থাকলেই বা কোন্ কাজে লাগতো! একটা কথা নেই কারোর মুখে, পাথরের মত স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি।

তোমাদের বলবো কী, অমন ভয় কখনো তোমারা যেন না পাও। তখন হয়তো সাতটা হবে, কি সাড়ে-সাতটা, শীতের সমস্ত দীর্ঘ রাত সামনে প'ড়ে। শীতের সেই দীর্ঘ, অন্ধকার রাত ঠিক ঐ ভাবে ঐ গাড়িতে ব'সে আমরা কাটিয়ে দিলুম—কী ক'রে কাটিয়েছিলুম এখন ভালো করে মনে করতে পারিনে।

বেশি আর বলবার নেই, পরের দিন সকালে সশরীরে রাঁচি পৌঁছিয়েছিলুম সকলেই। সমস্ত রাত্রি একটা গাড়ি গেলো না ও রাস্তা দিয়ে, সমস্ত রাত্রি একটা অন্ধ-

কার হিমসমুদ্রের মত আমাদের বুকের উপর চেপে ব'সে রইলো। আর ভোরবেলা যখন ফরেস্ট্ সার্বিসের এক সায়েব তাঁর গাড়িতে যেতে-যেতে আমাদের উদ্ধার করলেন, তখন শীতে আর শরীরের কষ্টে আমরা প্রায় আধ-মরা।

ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, হয়তো গাড়িটা এমনি খারাপ হ'য়ে গিয়ছিলো, হয়তো ভুল দেখেছিলুম। কিন্তু আমরা তিন জনেই কি একসঙ্গে ভুল দেখলুম? আর একই রকমের ভুল দেখলুম তিন জনেই—ভীষণ ঢ্যাঙ্গা একটা লোক, ভীষণ কালো, মাথায় পাগড়ি বাঁধা!

মেট্রোতে মুড়ী

রবিবার দুপুরবেলা ব'সে-ব'সে হাই তুলছি। কোন কাজ নেই। গরমও পড়েছে বড্ড, আশ্বিন মাসে যখন প্রচণ্ড রোদ ওঠে আর একটুও হাওয়া দেয় না, সেই দম-আটকানো, পিন-ফোটানো গরম। ভেবেছিলুম আনকোরা টাট্‌কা য়্যাডভেঞ্চার গল্পের বইখানা পড়বো, কিন্তু দু' পাতা প'ড়েই মনে হচ্ছে কোথায় যেন আগে পড়েছি। ব'সে আছি চুপচাপ।

এমন সময় পা টিপে-টিপে অনুতোষের প্রবেশ। পা টিপে-টিপে—কেননা, মেজকাকা পাশের ঘরে দিবানিদ্রায় সচেষ্ট; যে-বেচারারা নেহাৎই ছেলেমানুষ, তারা যেন কোন রকমেও তাঁর সেই মহৎ চেষ্টায় বাধা না দেয়, এই হচ্ছে তাঁর তিন নম্বর আইন। এক আর দুই নম্বর এখন না-ই শুনলে।

'কী রে অনুতোষ, কী মনে ক'রে?'

কপালের ঘাম মুছে অনুতোষ বললে, 'চল্।'

'কোথায়?'

'চল্, সিনেমা দেখে আসি।'

'পাগল! এই রোদ্দুরে!'

'কী যে বোকার মতো কথা বলিস! মেট্রোর ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা! গরমের দিনের দুপুর কাটাবার জায়গাই যে ঐ।'

'আচ্ছা—চুপ কর্।' বাক্‌বিতণ্ডা করবার উপায় নেই, পাছে মেজকাকার হুম্‌কি শুনতে হয়। মনের মধ্যে নানা রকম প্রতিবাদ ফোঁস ফোঁস করছে, তবু চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

'তবে চল্!'

'পয়সা?'

'সেজন্য ভাবতে হবে না। ওঠ্ তুই। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।'

মাকে ব'লে, এমন কি চার আনা পয়সা আদায় ক'রে নিয়ে, (এটা দিয়ে 'হ্যাপি বয়' খাওয়া হবে) বেরিয়ে পড়লুম অনুতোষের সঙ্গে। খাঁ খাঁ রোদ, গাছের পাতা নড়ে না। এদিকে বালিগঞ্জের রাস্তায় ট্রাম তো আর সহজে আসবে না!

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি দু' জনে, এমন সময় একটা বুড়ী এসে আমাদের কাছে হাত পাতলো। ভিখিরীর জ্বালায় কোনখানে কি শান্তি আছে! আমরা একটু স'রে দাঁড়ালুম, কিন্তু ছায়াটুকু ছেড়েও যেতে পারি নে। বুড়ীটা আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। এমনিতেই ভিখিরী দেখলে আমার বড় ঘেন্না করে, তার উপর ভিখিরীদের মধ্যেও অমন বীভৎস কঙ্কালমূর্ত্তি চট্ করে চোখে পড়ে না। ও কিছু বল্‌লে না, ওর নুয়ে-পড়া শরীর থেকে যেন একখানা কাদায়-গড়া হাত বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলে রইল। আমি ওর দিকে না-তাকাবার যতই চেষ্টা করলুম, ততই আমার চোখ ওর ওপরে গিয়ে পড়তে লাগল। বিশ্রী!

অনুতোষ বললে, 'দ্যাখ, গরমে বুড়ীটা কি রকম ধুঁকছে। ঠিক কুত্তার মতো!'

আমি বল্‌লুম, 'যাক, ঐ ট্রাম এলো।'

'চল্ বুড়ীকে মেট্রোতে নিয়ে যাই, খুব ঠাণ্ডা লাগবে', ব'লে হো-হো করে হেসে উঠলো অনুতোষ।

একটু পরেই আমরা ট্রামে চেপে বসলুম। টিকস টিকস চলেছে বালিগঞ্জের ট্রাম, সময় আর কাটে না। এক যুগ পরে এসে পৌঁছনো গেল। রাস্তাটুকু পার

ও এখানে এলো কেমন করে............

হ'য়েই মেট্রো। আজ বড্ড ভিড়, জোর ছবি দিয়েছে। ন' আনা টিকিটের জানলায় ফিরিঙ্গি বাঙ্গালী মিশিয়ে দশ-বারজন দাঁড়িয়ে। অনুতোষই আজ 'বস্' করছে; সে এগিয়ে এলো টিকিট আনতে, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টিকিট নিয়ে এলো অনুতোষ, আমরা ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময়—ভাবতে পারো !—আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বুড়ী, সেই তার কাদায়-গড়া হাতখানা বাড়িয়ে ধরলো আমাদের সামনে ! আমরা তো হতভম্ব ।

'এ কী ! ও এখানে এলো কেমন ক'রে ?' ব'লে উঠলো অনুতোষ ।

আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এই মেট্রো সিনেমায়, সায়েব, মেম আর ঝক্‌ঝকে বাঙ্গালীর ভিড়ের মধ্যে ওকে যে কী বেখাপ্পা, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল তা আর কী বলবো ! ওকে যে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে না, সেটাই তো আশ্চর্য্য—এ-সব জায়গায় তো আর কোনদিন ভিখিরী দেখি নি !

আমি বললুম, 'আমাদের ট্রামে ক'রেই উঠে এলো নাকি ?'

অনুতোষ বললে, 'হাঁ রে, ট্রামে এসেছে না রোল্‌স্ হাঁকিয়ে এসেছে ।'

'তবে ও এলো কি ক'রে ? উড়ে তো আর আসে নি ?'

'নে, নে, আর মাথা ঘামাতে হবে না। চল্ ভিতরে বসি গে ।'

বুড়ীটা কিন্তু সেই একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একটি কথাও বলছে না, একটু নড়ছেও না। চারিদিকে এত লোক—ওকে কেউ লক্ষ্য করছে না কেন ? আশ্চর্য্য !

ভিতরে গিয়ে ব'সে পড়লুম, কিন্তু মাথার মধ্যে কথাটা কেবলই ঘুরতে লাগলো। অনুতোষকে বললুম—'দ্যাখ এ বুড়ী ঠিক সেই বুড়ীই তো ?'

'মনে তো হ'লো ঠিক সেই রকমই। কে জানে ! কলকাতায় কত ভিখিরী আছে, হ'তেও পারে এ আর-একজন। কিন্তু একেবারে এক রকম ।'

'যদি ও-ই হয়—কী ক'রে এলো বল্ তো ! আশ্চর্য্য না ?'

অনুতোষ চুপ ক'রে রইলো।

'তা ছাড়া', আমি চুপি-চুপি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছিল আমরা ছাড়া আর-কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না ।'

অনুতোষ হেসে উঠলো। 'তোর মাথা খারাপ হ'লো নাকি রে ?'

'তবে ওকে ওরা তক্ষুণি তাড়িয়ে দিলে না কেন ?'

'কী যে বলিস—ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে নি আর কি। নে, চুপ কর্। আরম্ভ হ'লো।'

একটা বেগ্নি রঙের ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে ব'সে সিনেমা দেখতে লাগলুম। নিউজ্-রীল হ'য়ে গেলো, আরম্ভ হ'লো দিগ্বিজয়ী ছবি। অনেকক্ষণ এক মনে দেখছি, হঠাৎ কী-রকম অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলুম। ছবির পরদা থেকে আমার চোখ নেমে এলো প্রেক্ষাগৃহে। আধো চাঁদের আকারে চেয়ারের পর চেয়ারের সারি—কত রকম লোক ব'সে—এ-ও দেখতে মন্দ লাগে না। তারপর হঠাৎ যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেলো।

ঠিক আমাদেরই সারিতে, আমাদের কয়েকটা চেয়ার পরে, সেই বুড়ী ব'সে। স্পষ্ট দেখলুম সেই রঙিন অন্ধকারে। ঠিক সে বসেছে চেয়ারে, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদায়-গড়া হাত সামনের দিকে বাড়ানো।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেলো, কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পর আস্তে একটা ঠেলা দিলুম অনুতোষকে। ফিস্ফিস্ ক'রে বললুম, 'ঐ ছাখ্।'

'কী?'

'ঐ যে—' আমি আঙ্গুল বাড়ালুম ওদিকে, কিন্তু তার আগেই অনুতোষের চোখ পড়লো গিয়ে ওখানে। সেই হলদে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলুম অনুতোষের মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো।

হয়তো আমাদের চোখের ভুল, হয়তো আমাদের দু'জনেরই মাথা-খারাপ হয়েছে। জোর ক'রে আবার সিনেমা দেখতে লাগলুম ; অর্থহীন কতগুলো ভেল্কিবাজি নেচে যাচ্ছে চোখের সামনে। একটু পর-পরই আমরা তাকাচ্ছি ওদিকে—হ্যাঁ, ঠিক ব'সে আছে বুড়ী, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদার মতো হাত সামনে বাড়ানো। মেট্রো সিনেমার ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ব'সেও ঘেমে জল হ'য়ে গেলুম।

হঠাৎ অনুতোষ বললে—'আর না, চল্‌।

আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম দু' জনে, নুয়ে-নুয়ে কয়েকটা পা বাড়িয়ে, দু' একটা হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে বাইরে এসে যেন বাঁচলুম। পিছনে ফিরে তাকালুম না একবারও। এক দৌড়ে এক্কেবারে রাস্তায়।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, বিরাট্‌ সহর, আর লোক, কত লোক!

ফিরতি ট্রাম ধরলুম। সারা রাস্তা দু' বন্ধু এক্কেবারে চুপ। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেমন একটা ভয় যেন গলা আঁকড়ে ধরলো; আবার যদি সেইখানে, সেই গাছের ছায়ায় ওকে দেখি! কিন্তু না—কিছু নেই, কেউ নেই। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই, হঠাৎ যদি আবার—! রাত্তিরে ভালো ঘুম হ'লো না।

পরের দিন খেতে ব'সে মা বললেন, 'কী কাণ্ড! কাল দেখি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় গাছের নীচে একটা বুড়ী ম'রে প'ড়ে আছে।'

বাবা বললেন, 'কত হচ্ছে এ-রকম

'মরে পড়েই আছে—কতক্ষণ পর কর্পোরেশনের লোক এসে নিয়ে গেলো।'

আমি বললুম, 'কখন্ বল তো?'

'এই তো দুপুরবেলা—তুই বেরিয়ে গেলি, তার একটু পরেই। কী বিশ্রী দেখতে! ও কি? তোর খাওয়া হ'য়ে গেলো?

আমি তাড়াতাড়ি পাতে জল ঢেলে বললুম, 'আর খাবো না।'

'কী হ'লো তোর?'

'কিছু হয় নি,' বলে আমি উঠে পড়লুম।

বঙ্কুর অফিসযাত্রা

বঙ্কুর মন ভাল নেই। চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে থাকে খাটে, আর যত শুয়ে থাকে, ততই মন আরো বেশি খারাপ হ'য়ে যায়। আগে শুলেই ঘুমিয়ে পড়তো, আজকাল বিধাতা সে-সুখও কেড়ে নিয়েছেন। এ-পাশ ও-পাশ আর হাঁসফাঁস ক'রে কত আর সময় কাটে বলো! গুন্‌গুন্ ক'রে যে একটা মল্লার কি মালকোষ ভাঁজবে সে-ফুর্তিই কি মনে আছে ছাই!

নাঃ, বঙ্কু আর সে বঙ্কু নেই। তার দাদারা বরাবর বলেছেন যে তার আছে কুঁড়েমির অসাধারণ প্রতিভা, সে প্রতিভা সে কি হারালো? তার আলস্য-শয্যা তার কণ্টক-শয্যা হয়ে উঠছে যে। সত্যি-সত্যি কি তার এমন দুর্ভাগ্য হ'লো যে সে অকেজো হ'তেও পারবে না? কেবলি নানারকম কথা মনে উঁকিঝুঁকি মেরে মনটাকে একেবারে ঝাঁজরা ক'রে দিয়ে যাবে।

বয়েস তার সাতাশ হ'লো; অত বড় আস্ত একটা পুরুষমানুষ হাই তুলে আর গুন্‌গুন্ ক'রে দিন কাটাবে, এটা নাকি মোটেও আর শোভা পায় না। বাড়ির লোকের

মুখে এ-কথা শুনে-শুনে তার মেজাজই গেছে বিগড়ে। শুতে-বসতে মনটা কেবলই ছটফট করে। দিনে দূরে থাক্, রাত্রেও ঘুম হয় না। সত্যিই তো, আশে-পাশে সকলেই অফিস যাচ্ছে, কাজকর্ম্ম করছে ; তার কাজের মধ্যে পেটেণ্ট-পম্প্ আর গিলে-করা পাঞ্জাবি প'রে সন্ধ্যেবেলা বিনয়ের বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেয়। ধিক্ তার জীবনকে। একবার মনের মত একটা কাজ পায় তো চুটিয়ে দেখিয়ে দেয় কাজ কাকে বলে !

মনে-মনে সে কল্পনা করে, কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় সে রোজ অফিসে বেরুচ্ছে। তার অফিসের ভাত দেবার জন্য মা ও বৌদিদের কী প্রচণ্ড তাড়া ! মা-বৌদি থেকে আরম্ভ ক'রে জুতো বুরুশ করার বনমালী চাকর পর্য্যন্ত তার চোটপাটে অস্থির। বাবাঃ, এক মিনিট দেরি হ'লে রক্ষে আছে ! সায়েবের যা মেজাজ ! নিখুঁত স্যুট প'রে সে বেরুলো (স্যুট তো পরতেই হবে), তারপর অফিসে পৌঁছনোমাত্র তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি কাগজ-পত্রের একটি গন্ধমাদন রেখে গেলো তার টেবিলে। সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজের একেবারে পঞ্জাব মেল, মাঝখানে শুধু একটা ইষ্টিশানে আধ ঘণ্টা, তখন লাঞ্চ খেতে যেতে হয়। বাড়ি যেই ফেরা বনমালী ছুটে এসে নিচু হ'য়ে ব'সে যায় জুতোর ফিতে খুলতে,মা দৌড়িয়ে আসেন জলের গেলাস নিয়ে বৌদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রচুর খাদ্য সমেত চা এনে উপস্থিত করেন। উঃ, কী হাড়ভাঙা খাটুনি অফিসের।

তারপর মাসের শেষে যে আড়াইশো টাকা পাওয়া যাবে সেটাও তুচ্ছ নয়। (বঙ্কু মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছে যে দু'শো হ'লেও চলে !)

২

একদিন স্বপ্ন দেখতে-দেখতে বঙ্কুর বয়েস সাতাশ পেরিয়ে প্রায় আটাশ হ'তে চলেছে এমন সময় একদিন সত্যি-সত্যি তার স্বপ্ন সফল হ'লো। দাদারা চেষ্টা ক'রে এক কোম্পানির দফ্‌তরে তাকে ঢুকিয়ে দিলেন। সে নিজেও কম চেষ্টা করেনি ; প্রাণ থাকে কি যায় পরোয়া করেনি। রোদে কি বৃষ্টিতে, দিনে কি রাত্রে, বাস্-এ কি ট্র্যামে একমাস ধ'রে সে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, ওখান থেকে সেখানে ! যা ঝামেলা বলবার নয়। এর চিঠি নিয়ে ওর কাছে যাও ; রোহিণীবাবুর মাসতুতো ভাইয়ের সুপারিশ

নিয়ে মোহিনীবাবুর ভাগ্নি-জামাইয়ের কাছে; ঘুরতে-ঘুরতে বঙ্কুর মানুষ জাতটার উপরেই অশ্রদ্ধা জন্মে গেলো। তবু ভিতরে ভিতরে মনটা তার খুশিই লাগছিলো; কেমন, কাজ নাকি সে করতে পারে না। এইবার ত্যাখো!

আর এ তো সবে সুরু! অফিসের পালা আসুক্ না এবার! তখন মা যদি আবার উল্টো কাঁদুনি গাইতে সুরু করেন, যদি প্যানপ্যান ক'রে বলতে আসেন 'বাবা

বঙ্কু, কাজ করবি বলে' কি প্রাণটা দিবে ? নিজের শরীরের দিকে একবার তাকাস।' —তা'হলে তখন সে দেখাবে মজা।

চাকরি হ'লো আফিসে। মাইনে অবিশ্যি আড়াইশো টাকা নয়, এমন কি তু'শো টাকাও নয়—যা-ই হোক্, তাতে কিছু এসে যায় না! টাকার জন্যে সে কেয়ারই করে ভারি! লম্বা মাইনে পেয়ে পায়ের উপর পা তুলে ব'সে থাকতে তো সে চায় না; সে চায় কাজ করতে, কাজের লোক হ'তে, ইচ্ছে করলে সে-ও যে প্রকাণ্ড কেজো হ'তে, পারে সেইটে লোককে দেখাতে। সত্যি, শুয়ে বসে তার হাড়ে যেন ঘুণ ধ'রে গেছে, শরীরে গেছে শ্যাওলা প'ড়ে। এইবার সে দেখিয়ে দেবে যে তার দিন আধ মিনিটেরও সময় মেপে চলে। 'ভারি ব্যস্ত, একটুও সময় নেই,' সামনে কোনো কাল্পনিক আগন্তুক বসিয়ে কতবার কত সুরে যে সে এ-কথা বলে তার ইয়ত্তা নেই। যতবার বলে, রোমাঞ্চ হয় ততবার। 'আর আড়াই মিনিটের মধ্যে আমাকে বেরুতে হবে,' 'আপনার যা বলবার চার মিনিটের মধ্যে বলুন,' এখন থেকে তার কথাবার্ত্তা হবে এই ধরণের। ভাবতেও থ্রিলিং।

সে পরের কথা, প্রথম দফায় তুটো স্যুট তো তৈরি হ'লো। আনুসঙ্গিক সার্ট আর রুমাল, টাই আর কলার, জুতো আর মোজায় ভ'রে উঠলো ঘর। হিসেব করলে দেখা যেতো তার একমাসের মাইনের কিছু বেশীই খরচ হ'য়ে গেলো সাজসজ্জায়। তা হোক্, আপিস করতে হ'লে ও সব লাগেই।

আধ ঘণ্টার যত্নের নিখুঁতরকম কোট-পাৎলুন ইত্যাদি প'রে বঙ্কু গেলো প্রথম দিন আফিসে। দশটার সময় ট্রামে বেজায় ভিড়, বসবার জায়গা হয় কি হয় না। বঙ্কু তাকিয়ে দেখলো পাৎলুন পরা, রোগা আর মোটা, কালো আর ফর্সা, ছ'শো টাকার আর ছত্রিশ টাকার—নানারকম লোক চলেছে ট্রাম ভর্ত্তি ক'রে। সকলেই অফিসযাত্রী, সকলেরই বড় ব্যস্ত ভাব, মুখের চেহারা গম্ভীর। এতগুলো লোকের মধ্যে সে-ও একজন, সেও চলেছে অফিসে, বিনা কাজে ভ্যাগাভণ্ডামি করতে বেরোয়নি—কথাটা ভাবতে সার্ট-কোটের নিচে বঙ্কুর বুক অনেকখানি ফুলে উঠলো। আর অফিসের

লিফট্‌ম্যান যখন সেলাম ক'রে দরজা খুলে দিলে, তার ইচ্ছে হ'লো তক্ষুনি আস্ত একটা টাকা বখ্‌শিস দিয়ে দেয় লোকটাকে।

দশটা বেজে পঁচিশ মিনিটে সে তার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলো। ততক্ষণে চাকুরেরা সকলেই প্রায় এসে গেছে; প্রকাণ্ড হল্ ভ'রে প্রায় দু'শো মাথা এক্ষুনি কাজের চাপে নিচু হবে। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন জমকালো; খটাখট করছে টাইপ-রাইটার, ক্রিং-ক্রিং করছে টেলিফোন, বেয়ারাগুলো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে— সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা ক'রে বঙ্কুর মনে এমন উৎসাহের বন্যা ডাকলো যেন এই সমস্ত অফিসের কাজ সে একাই অনায়াসে করতে পারে। কোট খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে সার্টের আস্তিন গুটিয়ে সে—

প্রচণ্ড বেগে কাজে লাগতে যাবে, কিন্তু কাজ কই? এগারোটা, বাজলো বারোটা, অতগুলো যে তক্‌মা-আঁটা বেয়ারা, তাদের একজনও তার সামনে একখানা কাগজও এনে রাখলে না। ব'সে ব'সে তার ঘুম পেয়ে গেলো। হায়রে, একদিন নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি, আর আজ কিনা এই অফিসের শক্ত চেয়ারে ঘুম ভর করলো এসে।

চোখ রগ্‌ড়ে সে এদিক-ওদিক তাকালো। তার টেবিলেই আর এক ভদ্রলোক হেলান দিয়ে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন। বঙ্কু একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে ভীরুভাবে বললে; 'মশাই শুনছেন?'

ভদ্রলোক একটু নড়লেন না চড়লেন না, আড়চোখে একটু শুধু তাকালেন বঙ্কুর দিকে।

'ব'সে থাকতে-থাকতে গা ব্যথা হ'য়ে গেলো যে,' বললে বঙ্কু।

ভদ্রলোক খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন, 'গা-ব্যথা করে তো ময়দানে হাওয়া খেয়ে আসুন, কি বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।'

যেন ত্রিশ বছর ধ'রে চাকরি করছে, এমনি সুরে বঙ্কু বললে: 'অফিসে মামা-বাড়ির আবদার কিনা।'

ভদ্রলোক হেঁড়ে গলায় বললেন : 'নিজের কাজ করুন মশাই, দেখছেন না আমি ব্যস্ত।'

'কাজ করতেই তো এসেছিলুম, কাজ তো দেখিনে।'

'হাড়গোড় টন্‌টন্ করে তো ফুটপাথে গিয়ে ডিগ্‌বাজি খান,' ব'লে ভদ্রলোক কাগজের পাতা উল্‌টিয়ে গভীরভাবে তার মধ্যে মগ্ন হলেন।

তারপর চুপ ক'রে ব'সে রইলো বঙ্কু। ভাবলে এই প্রথম দিনে, তাই আমায় ওরা রেয়াৎ করছে। তা ছাড়া আজ শুক্রবার, সপ্তাহের শেষ, কাজের তাড়াও বেশী নেই বোধ হয়। ভাবতে-ভাবতেই দেড়টা বাজলো, লাঞ্চের ছুটি হ'লো। ট্রামে ক'রে চৌরঙ্গির রেস্তোরাঁয় গিয়ে সে এক পেয়ালা চা আর ছুটো চপ্ খেলো। আরো খেতো, কিন্তু পাছে দেরি হ'য়ে যায় ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে এলো।

তার পর থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত সে ঘন্টাখানেকের মত কাজ পেলো—বাকি সময় ঠায় ব'সে রইলো চুপ ক'রে। কংক্রিটের বাড়িতে একটা কড়িকাঠও নেই যে গুণবে!

তার পাশের ভদ্রলোক দেড়টা অবধি তো খবরের কাগজই পড়লেন, এ দিকে লাঞ্চের ছুটির পর ফিরে এলেন চারটের সময়। তাঁর চেয়ারের পিঠে তাঁর সিল্কের চাদরখানা ছিলো তাঁর প্রতিনিধি হ'য়ে। তাঁর সঙ্গে আর কথা বলবার ইচ্ছে বঙ্কুর মোটেও ছিলো না; তবু না ব'লেও পারলে না : 'মশাই এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার?

'না—জিজ্ঞেস করলুম, এতক্ষণ যে অফিসের বাইরে ছিলেন, তার জন্যে কিছু—' ভদ্রলোক অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে হেঁ-হেঁ করে হাসলেন। -'ছ'চার দিন যাক্, সবই বুঝবেন।'

ছ'চারদিন গেলো, বঙ্কুও প্রায় বুঝে উঠলো। ঐ ভদ্রলোক—নাম তাঁর মুরারীবাবু—রোজ সাড়ে-দশটা থেকে দেড়টা পর্য্যন্ত একখানা খবরের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়েন, দেড়টা থেকে চারটে পর্য্যন্ত বাইরে থাকেন, চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ছ'চারটা কাগজে লাল পেন্সিলের দাগ দেন, তারপর উঠে চ'লে যান—এবার চাদর নিয়েই। সকলেই

যখন খুশি যাচ্ছে আসছে, যার খুশি টেবিলে পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে, গল্প-গুজব চলেছে ইচ্ছে মত। বঙ্কু অবাক হ'য়ে গেলো রীতিমত, একটা ঘা লাগলো তার মনে। এই নাকি অফিসের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি! হায়রে, আমাদের কোন স্বপ্নই কি সফল হ'তে নেই!

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম যে, বঙ্কু অফিসে যায়, গোটা দুই চিঠি লেখে, দেড়টার সময় বাড়ি ফিরে এসে ঘুমোয়, ওঠে চারটেয়, তারপর এক পেয়ালা চা খেয়ে আবার অফিসে যায়, একটু বসে, বাজে পাঁচটা, আসে উঠে। কি সেই ভ্যাপসা দুপুর-বেলায় পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, লেডলর বাড়ির কাঁচের জানলাগুলো নিরীক্ষণ করে হাঁফিয়ে ওঠে, মস্ত হাই তুলতে-তুলতে অগত্যা বাড়িই চ'লে আসে। বৌদিরা হয়তো সন্দেহ করেন যে সে অফিস পালাচ্ছে, কিন্তু তার অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখে কিছু বলতে সাহস পান না।

হায়রে, বঙ্কুর কপালে বুঝি আর কাজের লোক হওয়া নেই। ঘেন্না ধ'রে গেলো ওর। এটা যেন বিশেষ ক'রে তার উপরেই ঈশ্বরের শাস্তি। কেমন! কুঁড়েমি করতে ভালোবাসতে, এই নাও কুঁড়েমি। কিন্তু কুঁড়েমির জন্য এত বড় একটি অফিসের সৃষ্টি কেন? কোট-পাৎলুন প'রে শক্ত চেয়ারে ব'সে কত আর ঝিমোনো যায়! কুঁড়েমি করতে হ'লে বাড়ির বিছানাতেই গড়াব, এখানে মরতে আসব কেন!

শেষটায় মরীয়া হ'য়ে বঙ্কু একদিন সোজা অফিসের বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাজির। বড়বাবু হারাণ পালিত বেজায় মোটা, সর্ব্বদা পান-জরদা চিবোচ্ছেন, দেখে ভালমানুষ ব'লেই মনে হয়। বঙ্কু গিয়ে কাছে দাঁড়াতে বললেন: 'এখন দেখা হবে না।'

বঙ্কু অবাক হ'য়ে বললে: 'আজ্ঞে!'

'বলছি—এখন জেনারেল ম্যানেজার ব্যস্ত আছেন।'

'আমি আপনার কাছেই একটু এসেছিলুম।'

এইবার হারাণবাবু মুখ তুলে ভালো ক'রে তাকিয়েই বললেন, 'ও, আপনি! আমাদের নতুন অ্যাসিষ্ট্যান্ট! এমন হিউজ ষ্টাফ, মুখ চিনে রাখাই মুস্কিল। তা আপনার কী চাই?

'আজ্ঞে আমি কাজ চাই,' বিনীতভাবে বঙ্কু বললে।

'কাজ! কাজ তো পেয়েছেন।'

'চাকরি পেয়েছি, কিন্তু কাজ তো কিছু দেখছিনে।'

'আমাদের এখানে এই রকমই লাইট ওয়ার্ক,' বড়বাবু হেসে বললেন।

বঙ্কু বললে,—'কিছু মনে করবেন না, বিনা-কাজের চাপে ম'রে যাচ্ছি।'

বড়বাবু হঠাৎ চ'টে গিয়ে বললেন,—'আপনি তো কুলির সর্দ্দার নন যে যতক্ষণ মুখে রক্ত না ওঠে ততক্ষণ কাজ হ'লো না!'

বঙ্কু খুব নরম সুরে বললে, 'এই তো দেখুন সাড়ে দশটা থেকে ঠায় বসে আছি, ঘাড় ব্যথা হ'য়ে গেলো। দয়া ক'রে কিছু কাজ দিন। রোজই এ-রকম, আজ আর সইতে না পেরে আপনাকে বলতে এলুম।'

'আচ্ছা আচ্ছা, হবে'খন, সবই হবে। এই তো সেদিন মোটে এলেন, এত ব্যস্ত হ'লে চলে!'

'সময় যে কাটে না,' করুণ সুরে বললে বঙ্কু।

'কাজ তো আর আপনার ফরমায়েস মত গড়াতে পারিনে,' বড়বাবু একটু বিরক্ত হ'য়েই বললেন, 'কাজ হলেই পাবেন—এখন যান, নিজের জায়গায় বসুনগে।'

বঙ্কু বললে: 'দেখুন, লোকের নানারকম সখ থাকে, আমার হচ্ছে কাজের সখ; ভয়ানকরকম কাজ করবো এই আশা নিয়েই অফিসে ঢুকেছিলুম।'

'ও বুঝেছি, বুঝেছি। তা আমি ম্যানেজার সায়েবকে ব'লে দেখবো, সামনের মাস থেকেই আপনার মাইনে দশটাকা বাড়ানো যায় কিনা। হ'লো তো?'

মনে-মনে অত্যন্ত চ'টে গিয়ে বঙ্কু বললে, 'আমি কি মাইনে বাড়াবার জন্যে এসেছিলুম নাকি আপনার কাছে? মাইনে আমি বেশি চাইনে, আমাকে বরঞ্চ দশটাকা কম দেবেন কিন্তু আমি কাজ চাই।'

'আচ্ছা ক্ষ্যাপাটে লোক তো আপনি! কাজ-কাজ ক'রে পাগল ক'রে তুললেন

যে! আচ্ছা, এই যে এতগুলো লোক দেখছেন অফিসে, তারা কী কাজ করছে?'

'কিছুই না।'

'তবে? মাঝখান থেকে হঠাৎ আপনার সামনে একরাশ কাজ এনে রাখি কোত্থেকে বলুন? খাতির ক'রে যদি আপনাকেই সব কাজ দিই, ওরাই বা মনে করবে কী! সকলে যেমন চলে, আপনিও তেমনি চলবেন। এতে না পোষায় তো অন্য পথ দেখুন।'

বিষণ্ণমনে বন্ধু ফিরে গেলো তার চেয়ারে, বিষণ্ণমনে ফিরে এলো বাড়ীতে শক্ত একটা কাঠের চেয়ারে ব'সে তুড়ি দিয়ে আর হাই তুলেই তার জীবন কাটবে তা'হলে। এর চেয়ে রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করাও যে ভাল ছিল!

বিশেষ কিছু নয়, সামান্য এক বাক্স ক্লিপ নিয়ে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কে জানতো! ক্লিপ, অতি সাধারণ ক্লিপ, যা দিয়ে কাগজ আটকায়। পঞ্চু গল্প লেখে কিনা, তার ক্লিপ দরকার। বড়ো-বড়ো ফুলিশ্‌কেপ কাগজে গোল-গোল হাতের লেখায় গল্পগুলোর ফেয়ার কপি করে, তারপর লম্বা খামে ভ'রে পাঠিয়ে দেয়, কিছুদিন পরে যথারীতি ফেরত চ'লে আসে। ডাকখরচ পঞ্চুকেই আগাম দিয়ে দিতে হয় অবশ্য; টিকিট না দিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না, সব কাগজেরই এই নিয়ম।

সেই কাগজগুলো আটকাবার জন্যেই ক্লিপ দরকার।

কিন্তু সমস্ত গিরিডি খুঁড়েও এক বাক্স ক্লিপ পাওয়া গেল না। কোলডিহা থেকে বারগণ্ডা পর্য্যন্ত সমস্ত সহর সে চ'ষে ফেললো, কোনো দোকানেই ক্লিপ নেই। সকলেই প্রথমটায় ছোট মেয়েদের চুল আটকাবার ক্লিপ দেখিয়েছে, কিন্তু পঞ্চু গম্ভীর হ'য়ে বলেছে—'এ-জিনিস নয়, কাগজ আটকাবার ক্লিপ।'

কাগজ আটকাবার ক্লিপ! বেশীর ভাগ দোকানিই এ-হেন জিনিসের নাম শোনেনি। কেউ-কেউ বা নাম শুনেছে, চেহারা ছাখেনি।—'একগ্রোস যদি নেন, তবে কলিকাতায় অর্ডার দিতে পারি, চারদিন পরে পাবেন।'

একগ্রোস মানে একশো চুয়াল্লিশ। একগ্রোস নিয়ে সে কী করবে! একশো চুয়াল্লিশটা গল্প লিখতে তো এক বছর! তাছাড়া, গল্পগুলো তো ফেরতই আসবে, একটা ক্লিপেই অনেকবার চ'লে যায়। নাঃ, একগ্রোস কিনলে স্রেফ্ লোকসান।

পঞ্চু মন-খারাপ ক'রে বাড়ি চ'লে আসে। গিরিডি সহরটার উপরেই তার অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। আরে ছ্যাঃ, এখানে আবার মানুষ থাকে! একটা ক্লিপ পাওয়া যায় না! পাওয়া যাবেই বা কেমন ক'রে এখানে তো কোন সাহিত্যিক থাকে না, ক্লিপ কিনতেই বা আসবে কে। থাকে তো শুধু মাইকার দালাল আর কয়লার 'কুলি, তাদের কোনো কাজে তো আর ক্লিপ লাগবে না!

অগত্যা পঞ্চু ভাবে, আলপিন দিয়েই কাগজ আটকে দিবে। কিন্তু আটটা-দশটা ফুলিশ্‌কেপের পাতা কি একটা ক্ষুদে আলপিন গাঁথতে পারবে? তা ছাড়া, আলপিনটা যদি কোন রকমে সম্পাদকের (কি তাঁর ছোট ছেলের) আঙুলে ফুটে যায়, তাহ'লেই তো গল্পের দফা রফা। একবার পিন ফুটলে আর কি সম্পাদক সে গল্প পড়বেন, না কি পড়লেই তাঁর ভালো লাগবে!

মনের দুঃখে সে গল্প লেখাই প্রায় ছেড়ে দেয়-দেয় এমন সময় ঘোর অন্ধকারে আলো দেখা গেলো। খবর পেলো মণ্টু যাচ্ছে কলকাতায় উইক-এণ্ডে।

মণ্টু তার প্রাণের বন্ধু। পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে দু'জনে, বিকেলে একসঙ্গে উশ্রী নদীর ধারে হাওয়া খায়, শীতকালে একসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান হিল্-এ যায় চড়ুইভাতি করতে। উশ্রী ফল্‌স্-এ গিয়ে দু'জনে একসঙ্গে একটা ছবি তুলিয়েছিলো পর্য্যন্ত,' দু'জনেরই ঘরে সেটা বাঁধানো দেখতে পাবে। পঞ্চু তার সব গল্প মণ্টুকে প'ড়ে শোনায়, কেননা মণ্টুর মতামতের উপর তার গভীর বিশ্বাস। সব গল্পের শেষেই মণ্টু বলে—'বাঃ, চমৎকার হয়েছে।' পঞ্চু যখন পড়ে, মণ্টু চোখ বুজে-বুজে গভীর মন দিয়ে শোনে—হঠাৎ এক-এক সময় তার নাকের ভিতর দিয়ে ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ বেরোয়।

পঞ্চু বলে—'ঘুমুচ্ছিস নাকি, মণ্টু?

মণ্টু বলে—'না, ঘুমুবো কেন? তুই প'ড়ে যা, আমি শুনছি।'

এই ব'লে আবার সে চোখ বোজে। খানিক পরে আবার ঘোঁৎ ক'রে ওঠে। পঞ্চুর এক-এক সময় সন্দেহ হয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে ; কিন্তু ঘুমোলে তো আর সে শুনতে পাচ্ছে না, আর না-শুনে কী ক'রে বলে যে গল্পটা চমৎকার হয়েছে ? চমৎকার যখন বলে, তখন নিশ্চয় শুনেছে, আর শুনেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি। কথাটা ভেবে পঞ্চু ভারি আরাম পায় মনে-মনে।

একদিন হঠাৎ সে ব'লে ফেলে, 'আচ্ছা মণ্টু, তুই তো খুব ভালো বলিস, কিন্তু কেউ ছাপে না কেন বল্ তো ?'

'আরে ঐ কাগজ ওয়ালাদের কথা বলিস কেন ! সবই মুখ-চেনাচেনির ব্যাপার, বুঝলি না ?'

'হ্যাঁ, তা-ই হবে। অচেনা লোকের লেখা বোধ হয় পড়েও না।'

'ক্ষেপেছিস ! আমার মামা কলকাতার এক ছাপাখানায় কাজ করেন, সেখানে "বৈদ্যহিতৈষী" আর "বরিশাল-বন্ধু" ছাপা হয়। তাঁর কাছে সব কথা শুনেছি।'

এরপর পঞ্চু মুগ্ধ হ'য়ে মণ্টুর কাছে কলকাতার কাগজওয়ালাদের সব গল্প শোনে। মামা কী বলেছিলেন বা কতটুকু বলেছিলেন মণ্টুর ঠিক মনে পড়ে না ; তবে বেশ উৎসাহ-সহকারেই সে ব'লে যায় ; কী করলে গল্প ছাপা হ'তে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশও দেয় দু' একটা।

সেই মণ্টু উইক-এণ্ডে কলকাতায় যাচ্ছে। পঞ্চু বললে, 'খুব ভালো হ'লো, আমার জন্যে এক বাক্স ক্লিপ নিয়ে আসিস।'

'সে আর বেশী কথা কী। নিশ্চয়ই আনবো।'

'আর··· শোন্, তোর মামার সঙ্গে দেখা হবে তো ?'

'বাঃ, তাঁর ওখানেই উঠবো যে।' তারপর, পঞ্চু কিছু বলবার আগেই বললে, 'এবারে বেশ ভালো ক'রে কাগজওয়ালাদের খোঁজ নিয়ে আসবো। মামা সব জানেন কিনা।'

'তোর মামা তো ইচ্ছে করলেই পারেন ছেপে দিতে, না রে ?'

মণ্টু বললে, 'বাঃ, পারেন না! ছাপাখানার সব বই তিনিই তো ছাপান।'

এবার পঞ্চু প্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো। 'তা হ'লে তাঁকে একটু বলবি তো মনে ক'রে?'

'নিশ্চয়ই বলবো। তিনি অক্ষরগুলো সাজিয়ে না দিলে কিছু ছাপা হবারই তো জো নেই। মামাকে কি তুই সোজা লোক ভেবেছিস?'
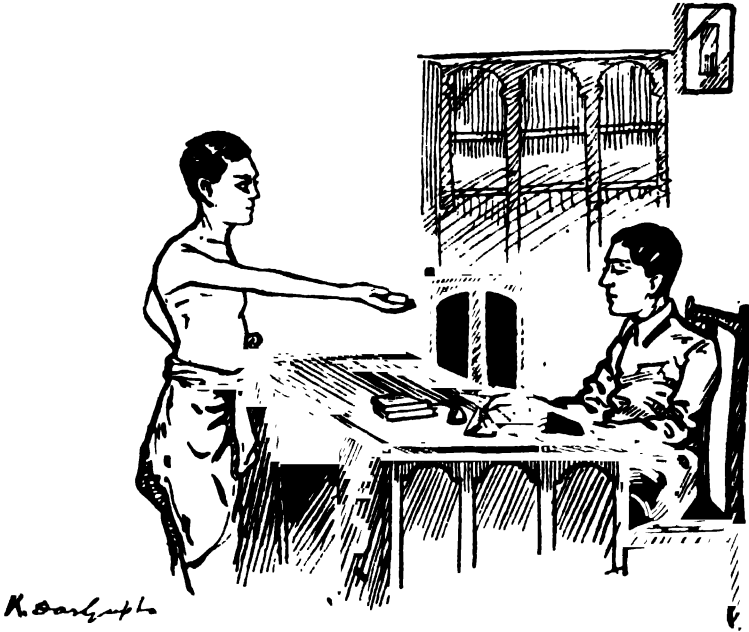
চাকর জবাব নিয়ে এল·

'তাহ'লে গল্প দু' একটা নিয়ে যাবি নাকি?,

'না, না, এখন থাক। আগে সব কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে আসি।'

এর পর দু' বন্ধুতে আরো অনেক কথা হ'লো! সব কথার শেষে পঞ্চু আবার বললে. 'ক্লিপ এক বাক্স আনিস কিন্তু মনে ক'রে। ভুলিসনে যেন।'

'না, না, ঠিক আনবো।'

মণ্টু বেস্পতিবারে গিয়ে সোমবারে ফিরে এলো। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'তেই গম্ভীর মুখে বললে, 'সব ঠিক ক'রে এসেছি।'

পঞ্চু দুরু-দুরু বক্ষে আরো শোনবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

'মামার প্রেসে এবার কার সঙ্গে দেখা জানিস্?'

'কার সঙ্গে?'

'ক্ষিতীশ ঘোষ—নাম শুনেছিস?'

পঞ্চু খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বললে, 'কই, মনে পড়ছে না তো।'

'তুই একটা হাঁদা। ক্ষিতীশ ঘোষ—যাঁর লেখা "জাগরণ" "বঙ্গ-নারী" "আধ-কথা" এ-সব কাগজে ছাপা হ'য়ে থাকে! তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো—আলাপ হ'লো। তাঁর ঠিকানায় তোর সব লেখা পাঠাবি এখন থেকে, তিনি ছাপিয়ে দিবেন।'

রোমাঞ্চিত পঞ্চু চুপ ক'রে রইলো।

'তুই দেখলি ঐ···ক্ষিতীশবাবুকে? কথা বললি তাঁর সঙ্গে?' যে-ব্যক্তির লেখা প্রায়ই ছাপার অক্ষরে বেরোয় তাকে যে চোখে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কথা বলা যায় এ যেন পঞ্চুর বিশ্বাস হ'তে চায় না।

জানিস, ক্ষিতীশবাবু বলেছেন এবার পূজোর ছুটিতে গিরিডি আসবেন। তখন তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আর কি, তোর তো হ'য়ে গেলো, একদিন খাইয়ে দিস্। এই নে তোর ক্লিপ।'

মণ্টু তাহ'লে ভোলেনি, ঠিক মনে ক'রে ক্লিপের বাক্স এনেছে। কৃতজ্ঞতায়, সুখে ও সৌভাগ্যে পঞ্চুর ভিতরটা যেন ছলছল করতে লাগলো। ছোট্ট কাগজের বাক্স ঝকঝক করছে ক্লিপ, দস্তুরমতো মেড ইন ইংল্যাণ্ড, চালাকি নয়।

'কত দাম রে?' পঞ্চু জিজ্ঞেস করলে।

'দু' আনা।'

'বলিস কী, এত সস্তা!'

'কলকাতায় সব জিনিসই সস্তা।'

'হবে না! ও তো আর গিরিডি নয়! এখানকার দোকানিরা, জানিস, ক্লিপ কাকে বলে তা-ই জানে না!' পঞ্চু খামকা অনেকখানি বেশি হেসে ফেললো।

রাত্তিরে সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নতুন একটা গল্প লিখে ফেললো। ওঃ ঐ ঝকঝকে ক্লিপ এঁটে সে যখন লেখাটা পাঠাবে, সম্পাদক কি তখনো না প'ড়ে পারবেন! তা ছাড়া, এখন তো ক্ষিতীশবাবুই আছেন।

পরের দিন তার মনে হ'লো মণ্টুকে ঐ ক্লিপের দাম দিয়ে দেওয়া উচিত। তক্ষুনি একটি দু'আনি নিয়ে গেলো মণ্টুদের বাড়িতে। পকেট থেকে সযত্নে দু'আনিটি বা'র ক'রে বললে, 'এটা নে।'

'কেন?' মণ্টু যেন কিছু অবাকই হলো।

'ঐ ক্লিপের বাক্সটার দাম।'

'যা-যাঃ, আর বখামি করতে হবে না। ওর আবার দাম দিবি কী রে?'

'বাঃ, জিনিসটা হ'লো আমার, তুই তার দাম দিবি কেন?'

'না-হয় দিলুমই। দু' আনা তো পয়সা, হয়েছে কি তাতে?'

'আমিই তো তোকে আনতে বলেছিলুম। দাম যে দেব এ তো জানা কথাই।'

'দাম দিবি জানলে আনতুমই না।'

মণ্টু কিছুতেই নিলে না দু'আনি, পঞ্চু মন-খারাপ ক'রে ফিরে এলো। সে ভেবে দেখলে, এই দু'আনা পয়সা তার পক্ষেও না দেওয়া অন্যায়, মণ্টুর পক্ষেও না নেওয়া অন্যায়। সে নিজে কিনলে তো পয়সা দিয়েই কিনতো, দোকানি তো আর এমনি দিতো না।

বিকেলবেলা সে আবার গেলো মণ্টুর কাছে। গিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, 'ছাখো মণ্টু, এটা কিন্তু তোমার ঠিক হচ্ছে না।'

'কোনটা?'

'ক্লিপের দামটা তুমি দয়া ক'রে নাও।'

'হঠাৎ ক্ষেপে গেলি নাকি তুই?'

'আমি কিনলে তো পয়সা দিয়েই কিনতুম।'

'তুই তো আর কিনিসনি।'

'তুই তো কিনেছিস। দোকানি তো তোকে এমনি দেয়নি।'

'তাই ব'লে তোর কাছ থেকে এখন ছু'আনা নিতে হবে—না? কক্ষনো নেব না—ভাগ্।'

'তুই এটা না নিলে আমি একেবারেই শান্তি পাবো'না মনে।'

মন্টু বড়ো-বড়ো চোখে পঙ্কুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'তুই আমাকে ছোটলোক ঠাউরেছিস নাকি যে তোর কাছ থেকে ছু'আনা পয়সা নেব।'

'কেন, এতে ছোটলোকমিটা কী দেখলি? তুই তো আমার কাছ থেকে নিচ্ছিস না।'

'তবে কার কাছ থেকে নিচ্ছি?'

'বেশ, আমিই বা তোর কাছ থেকে কেন নেবো? ক্লিপের বাক্সটা তো আমার।'

'ইচ্ছে হয় ওটা উশ্রীর জলে ফেলে দে গে, যা। তাহ'লেই হবে তো?'

'আমার কাছ থেকে নিতে তোর সম্মানের হানি হয়, আমারই বা তোর কাছ থেকে নিতে সম্মানের হানি হবে না কেন? তোর চাইতে আমার সম্মান কি কম!'

'যা, যা, তোর সম্মান নিয়ে ব'সে থাক্‌গে। বাজে কথা আর বলতে হবে না।'

পঙ্কু আর একটি কথা বললে না; তক্ষুনি সেখান থেকে চ'লে এলো, বেশ গম্ভীর হ'য়েই। সেদিন আর ছু'জনের দেখা হ'লো না। পরের দিন পঙ্কু একটা চিঠি লিখলে:

'মন্টু,

তুমি এই ছু'আনিটি অবশ্য গ্রহণ কোরো। নয়তো আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

পঙ্কু।'

চিঠিটা, আর একটা ছু'আনি, একটা খামে ভ'রে পঙ্কু চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলে মন্টুর কাছে। খানিক পরেই সে জবাব নিয়ে এলো। মন্টু লিখেছে—

পঞ্চু,

তোমার দু'আনি ফেরৎ পাঠাচ্ছি। আবার যদি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলো, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবো ব'লে দিলাম।

মণ্টু'

খামের ভিতর সেই দু'আনি।

রাগে পঞ্চুর সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেলো। ওঃ, উনিই ভারি মানী লোক এসেছেন, জিনিসের দাম নিতে পারেন না! আমিই বা মানী কম কিসে?

সেদিন আর সে মণ্টুর বাড়ী গেলো না, মণ্টুও এলো না। দু' তিন দিন এমনি গেলো। তারপর পঞ্চু আর একখানা চিঠি লিখলে—

'মণ্টু,

আমি তোমাকে স্পষ্ট জানাতে ইচ্ছা করি যে কারো কাছে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তুমি এই দু' আনা গ্রহণ ক'রে আমাকে বাধিত করবে।

মণ্টু জবাব দিলে:

'তুমি ফের যদি আমাকে এ-রকম অপমান করবে তাহ'লে জীবনে আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।'

হোঃ! না বললেন কথা তো ব'য়ে গেল। মস্ত রাজা-উজির মনে করেন কিনা নিজেকে! দয়া ক'রে এক বাক্স ক্লিপ দিয়ে গরীবকে ধন্য করতে হবে না। নিতেই হবে ওঁকে পয়সা।

এর পরে পঞ্চু যে-চিঠি লিখলে তা এই:

'মহাশয়,

আপনি আমার জন্য কলিকাতা হইতে যে ক্লিপের বাক্স আনিয়াছিলেন তাহার মূল্য গ্রহণ করিতে আপনি আইনত, ন্যায়ত ও ধর্মত বাধ্য। আমি আপনার করুণার অনুগ্রহ-প্রার্থী নই। আপনার নিকট হইতে বিনামূল্যে কোন জিনিস গ্রহণ করিতে আমার আত্মসম্মান আহত হয়। আপনি এই দু' আনা গ্রহণ না করিলে বুঝিব আপনি আত্মম্ভরী

ও স্বার্থপর, এবং আমার পক্ষে আপনার এই হীনতায় স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না। ইতি নিবেদক

'পঞ্চানন দাস।'

এ চিঠির উত্তর এলো এই :

'মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি অতি ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি, আপনার নিকট হইতে বহু অপমান আমি সহ্য করিয়াছি, এইবার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আপনি কি মনে করেন আমি সামান্য দু' আনা পয়সার কাঙাল ? না কি, এই পয়সার লোভেই কলিকাতা হইতে ঐ ক্লিপের বাক্স আনিয়াছিলাম ? আপনার ঐ মুদ্রা আমি ফিরাইয়া দিতেছি, যদি সহস্রবার পাঠান সহস্রবারই ফেরৎ দিব, কেননা আমি ভদ্রলোক। আপনি যদি ভদ্র লোক হইতেন তাহা হইলে পুনঃপুনঃ আমাকে এ ভাবে বিরক্ত ও অপদস্থ করিতেন না। ইতি— নিবেদক

মণীন্দ্রনাথ সরকার।

এর পর থেকে দু'জনের আর মুখ দেখা-দেখি নেই।
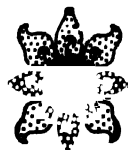
দেরাজে যত খেলনা, তার মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি একটা বল্ আর একটা লাটিম।

বললে লাটিম বল্‌কে ঃ

'এত কাছাকাছিই যখন থাকি ত্থ'জনে, এসো না আমরা বিয়ে করি।'

এদিকে বল্ মরক্কো চামড়ায় তৈরি ; তার ধারণা সে মস্ত ঘরের মেয়ে, ও-কথা কানেই তোলে না।

এসব খেলনা যে ছেলেটির, পরের দিন সে এসে লাটিমটা বার করে' নিয়ে তাকে লাল আর হলদে রঙ করে' দিলে, তারপর তার মাঝখান দিয়ে নতুন পেতলের পেরেক ঠুকে দিলে। তারপর সেই লাট্টু যখন ঘুরলো—সে এক দেখবার জিনিস।

বল্‌কে ডেকে সে বললে, 'দ্যাখো আমাকে, ছাখো একবার! কী বলো তুমি এখন? করবে বিয়ে? ত্থ'জনে মানাবে চমৎকার তুমি পারো লাফাতে, আমি পারি ঘুরতে, আমাদের মত সুখী স্বামী স্ত্রী খুঁজে বার করা সহজ হ'বে না।'

বল্ বলে উঠলো, 'বটে? আমার মা-বাবা ছিলেন মরক্কো চামড়ার চটি, সে-খেয়াল আছে তোমার? আর আমার শরীরের মধ্যে আস্ত একটা কর্ক্ আছে, জানো?'

লাট্টু জবাব দিলে, 'তা তো জানি। আমি ও মেহগনি কাঠের তৈরী—নায়েব মশাই নিজের হাতে আমাকে বানিয়েছিলেন। লাটিম তৈরি করা তাঁর পেশা, জানো তো।'

'সত্যি নাকি ?'

'যদি মিথ্যে বলি, আর যেন জীবনে না ঘুরি।'

'ভেবে দেখবো তোমার কথা,' বল্ বললে। কিন্তু কী জানো, এক বাবুইকে আমি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছি। যখনই আমি লাফিয়ে আকাশে উঠি, সে তার বাসা থেকে মুখ বার করে' বলে, 'আমাকে বিয়ে করবে?' মনে-মনে আমি হ্যাঁ বলেছি—আর মনে-মনে হ্যাঁ বলাও যা, মুখে বলাও তা-ই। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না।'

'মস্ত লাভ হবে তাতে!' বললে লাটিম। তারপরে আর এ নিয়ে কোনো কথা হ'লো না।

পরের দিন বল্‌কে নিয়ে যাওয়া হ'লো বাইরে। কী তার লাফ! লাটিম তাকিয়ে দেখলে, সে পাখির মত আকাশে উড়ে গেলো, এত উঁচুতে যে আর দেখা যায় না। তারপর ফিরে এলো, কিন্তু যতবার সে মাটি ছোঁয়, ততবার দ্বিগুণ লাফিয়ে ওঠে! এই লাফের হেতু হয়-তো সেই বাবুই পাখি, নয় তো তার শরীরের ভিতরের আস্ত কর্কটা।

কিন্তু ন'বারের বার সে আর ফিরে এলো না। ছেলেটি তাকে অনেক খুঁজলে, পাওয়া গেলো না।

'জানি সে কোথায় আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে লাটিম। 'সে গেছে বাবুইর বাসায়, সেখানে তার বিয়ে হচ্ছে।' লাটিম যতই কথাটা ভাবলে, ততই বল্‌কে তার আরো বেশি সুন্দর মনে হ'তে লাগলো; সে যে তাকে পাবে না, এতে তার মন আরো বেশী করে বলের দিকে ঝুঁকলো। তাকে ফেলে কিনা আর-একজনকে—! এ যে কখনো ভুলবে না। লাটিম বন্‌বন্ করে, গুন্‌গুন্ করে, কিন্তু তার বলের কথা কখনো ভুলতে পারে না। বছর কাটে, আরো বছর কাটে, তবু লাটিম সেই বলেরই আরাধনা করে।

এতদিনে লাটিমের অবিশ্যি বয়েস বেড়েছে, তাকে আর ছোকরা বলা চলে না।

হ'লে হবে কী, একদিন তার সারা গায়ে এমন সুন্দর সোনালি রঙ করা হ'লো যে এত সুন্দর তাকে কখনোই দেখায়নি। সে এখন গিল্টি-করা লাট্টু—আর কী ঘোরাই সে ঘুরলে, সারাক্ষণ গুন্‌গুন্‌ গান করে'-করে'—সত্যি, এমন আর কখনো কেউ ছাখেনি। কিন্তু হঠাৎ একবার সে অনেকটা দূর লাফিয়ে উঠলো, তার পর—যাচ্চলে'! কত খুঁজলো তারা, দিন ভরে' খুঁজলো—কোথাও তা.ক পাওয়া গেলো না।

তুমি আমায় বিয়ে করবে?

কোথায় সে?

সে লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে একটা পিপের মধ্যে। পিপেটা হাজর রকমের রাবিশে ভরা—তরকারির খোসা, ঘর ঝাঁট দেয়া ধুলো, ভাঙ্গা শিশি-বোতল—নৰ্দ্দমা থেকে সব গড়িয়ে পড়েছে।

'হায়রে, এখানে থেকে-থেকে আমার এমন গিল্টি রঙটাই না চটে' যায়! আর কী-সব পাড়া পড়শি এখানে—ছ্যাঃ!' আদ্ধেক চোখ খুলে সে দেখলে লম্বা একটা ফুল-কপির ডাঁটা তার ভয়ঙ্কর রকম কাছে পড়ে'—এই বুঝি চুঁয়ে ফেললো! আর চোখে পড়লো একটা অদ্ভুত গোল জিনিস, অনেকটা আপেলের মত দেখতে। কিন্তু আপেল নয় ওটা, আসলে একটা পুরোনো বল্—অনেক বছর নর্দ্দমায় শুয়ে-শুয়ে ভিজে একেবারে চুপ্‌চুপে।

গিল্টি-করা লাট্টুর দিকে তাকিয়ে বল্‌টা বললে, 'তবু এতদিনে সমান ঘরের একজনকে পাওয়া গেলো—দুটো কথা কয়ে' বাঁচবো। আমি খাঁটি মরক্কো চামড়ার তৈরি, এক মোক্তারের মেয়ে আমাকে সেলাই করেছিলো—আমার ভিতরে আস্ত একটা কর্ক পোরা। এখন অবিশ্যি আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু একবার এক বাবুইপাখির সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় হ'বো-হ'বো হয়েছিলো। তখনই পড়ে গেলুম নর্দ্দমায়, পড়ে' রইলুম পাঁচ পাঁচটা বছর—আর এখন ভিজে-ভিজে একেবারে ট্যাশ হ'য়ে গেছি। এক ভদ্র মহিলার পক্ষে এ কী বিশ্রী অবস্থা, ভাবো!'

লাটিম সব শুনলে, কিন্তু একটা কথাও জবাব দিলেনা। এতদিন যার জন্য সে শোক করেছে, তার কথা সে ভাবলে! আর যতই সে শুনলো, ততই সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলো যে এ আর কেউ নয়, এ সেই!

তারপর বাড়ির ঝি এসে পিপেটা ওল্টাতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে! পেয়েছি লাট্টু!'

গিল্টি-করা লাট্টুকে সে নিয়ে এলো ঘরে—ছেলেটা আবার তাকে ঘোরালে, সবাই আগেকার মত তাকিয়ে দেখলে, প্রশংসা করলে। কিন্তু বল্‌টার কথা আর-কিছু শোনা গেল না; লাটিমও আর কখনো বললে না তার কথা। আগেকার দিনে সে যে বলের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলো, এখন বুঝি তা মনেও নেই। কী করেই বা মনে থাকতে পারে, বলো—যখন লাটিম স্বচক্ষে দেখলে যে পাঁচ বছর ধ'রে নর্দ্দমার জলে পচে' পচে' তার এমন চেহারা হয়েছে যে তাকে দেখে আর চেনাই যায় না?

(হান্স আণ্ডারসেন)

সুপতি ব'লে যে-ছেলেটা হঠাৎ একদিন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হ'লো তার সঙ্গে ক্লাশের ছেলেদের ভাব এখনো যেন ভালো ক'রে জমলো না। চেহারাটাই তার কেমন বেখাপ্পা গোছের। লিকলিকে রোগা, লম্বা যেন তালগাছ, তার উপর মুখের ছাঁদ আর গায়ের রঙ অবিকল চীনেদের মতো। দেখতে সে অন্য কারো মতোই নয়; আর তার হাবভাব চালচলন এমন যে মানুষটাও সে অন্য কারো মতো নয়। ছেলেরা প্রথমটায় তাকে নিয়ে হাসি-তামাসা করতে গেছল, জুৎ হ'লো না। বিধু হচ্ছে ক্লাসের চাঁই ছেলে, সে চেয়েছিলো তাকে নিজের দলে ভিড়োতে, তা সুপতির ভাবখানা যেন বড়ই গম্ভীর। সে একা-একাই থাকে, দরকার না-হ'লে কারো সঙ্গে কথা বলে না, পিছনের বেঞ্চিতে ব'সে থাকে মোটা মোটা ইংরিজি বই চোখের সামনে খুলে—পড়ে না লোক দেখায় ঈশ্বর জানেন। শোভন ব'লে যে-ছেলেটা এবারের য়্যানুয়েল পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'য়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে, সে কিন্তু সুপতির দিকে আড়চোখে তাকাতে আরম্ভ করেছে। কে জানে, হয়তো দারুণ কিছু! এখন পর্য্যন্ত অবিশ্যি কোনোদিকেই সুপতির কোনো বিশেষত্বের নমুনা দেখা যায়নি, কিন্তু দেখা যায়নি বলেই তো ভয় বেশী। কে জানে ছেলেটা কোন্‌দিকে কী ক'রে বসে! কিছুই বলা যায় না।

ছেলেদের মধ্যে আড়ালে-আবডালে নানারকম কথা হয় ওকে নিয়ে। বিটকেল বিষ্টুটা বলে—'জানিসনে, ওর জন্ম কিনা হংকং-এ, তাই চেহারা ওর চীনেদের মতো।' অমনি ব'লে ওঠে অমূল্য 'বাপ্‌রে—হংকং! কিঙ্‌কংকং-এর পরেই।' অমূল্যর ফাজলেমি করার সখ খুব, কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে বেশি জোগায় না; বিষ্টু যা বলে তারই উপর টিপ্পনি কাটে আর হা-হা ক'রে হাসে। বিষ্টু আরো বলে, 'ছেলেবেলায় সাঙ্কি টাঙ্কির শেকড় খেয়েছিলো, তাইতেই তো অত লম্বা হয়েছে।' অমূল্য পুতুলের মতো ব'লে ওঠে 'সাঙ্কি-টাঙ্কি! তার চেয়ে ডাঙ্কি-মাঙ্কি বলো না—মানাবে ভালো।' ব'লে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

এ-সব হাসাহাসি সুপতির কানে যায় বইকি। তাই ব'লে সে কি চটে? আরে, আশে-পাশে কোথায় কী হচ্ছে তা লক্ষ্য করবার ফুরসৎই তো তার নেই। বিষ্টুর দল মনে-মনে বলে উঃ, ছাখো না দেমাক! ভাবে, ঐ কিং কং খেতাবটা একদিন সকলের সামনে জাঁকজমক ক'রে উপহার দিতে হবে; কিন্তু সুপতির চোখের দিকে তাকালেই ভালো ভালো রসিকতাগুলো যেন ধোঁয়া হ'য়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এদিকে শোভনের ইচ্ছা ওর বিদ্যের দৌড়টা একবার মেপে নেয়; কিন্তু পড়াশুনোর কোনো কথা পাড়লে কিছু না-ব'লে সুপতি এমনভাবে হাসে যার মানে বোঝা দায়। এদিকে সেদিন হ'লো কী, ইংরিজির বিনোদবাবু পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছনের বেঞ্চির দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেসা করলেন:

'সুপতি, তেমার দু'খানা বই-ই কি আইভানহো?'

সকলের চোখ গেলো সেদিকে। দেখা গেলো, আইভানহোর নিচে লুকিয়ে সুপতি কী আর একখানা বই পড়ছে। টিটকিরির হাসি উঠলো ক্লাশে।

কিন্তু সুপতি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'না স্যর, আর-একখানা হচ্ছে আইজ অ্যাণ্ড্ নো আইজ।'

গম্ভীরভাবে বললেন বিনোদবাবু: 'ক্লাশের মধ্যে বসে নভেল পড়া কি ভালো হচ্ছে?'

'এটা নভেল নয়, স্যর,' ব'লে সুপতি বোধ হয় মুচকি হাসলো।

।[illegible]বাবু আরো বেশি গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। একটু পরে বললেন' 'ওটা রেখে দাও, আইভানহোর সতেরো পৃষ্ঠা খোলো।'

নন্দর ঠ্যাঙ্ ভেঙেছে .....

এর পর সুপতি যেন ক্লাশের ছেলেদের চোখে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে গেলো। আড়ালে যত তারা ঠাট্টা করে, মনে-মনে ততই হিংসে করে। শোভন তো একদিন জোর ক'রেই ব'লে বসলো যে ও-সব ওর বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়; পাছে ধরা পড়ে যায়, সেই ভয়ে কারো সঙ্গে বেশি কথা বলে না। আসুক না হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাটা; তখনই সব ফাঁস হবে।

কিন্তু তার আগেই যে এই সুপতি এমন এক হাত নেবে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ব্যাপার হ'লো এই রকম। তাদের ক্লাশের নন্দ ইস্কুলের সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন, ব্যাট চলে যেন আগুন। গেলো বছর বীরেশ্বরী কাপ্‌টা নিতে-নিতেও তারা যে কেমন করে রাণী ভবানী হাই স্কুলের সঙ্গে হেরে গেলো সে এক অবাক কাণ্ড! এ-বছর তারা খুব ভালো তৈরি হয়েছে, ষ্টার একাডেমির কাছে এবার যে-দল এগুতে পারবে তাকে বাহাদুর বলতে হবে বটে! কয়েকদিন থেকে ছেলেদের মুখে এ ছাড়া কথা নেই। যারা-যারা খেলবে, তারা খোদ সেকেন্দর শাহর মতো ক্লাশ কামাই ক'রে মাঠেই হাত-পা ছুঁড়ছে, ভূগোলের পীতাম্বরবাবু আছেন সঙ্গে, তিনি এককালে অল্‌-বেঙ্গল ইলেভ্‌ন-এর রিজার্ভে ছিলেন। উৎসাহের একেবারে বান ডেকেছে, পরশুই খেলা আরম্ভ, এমন সময় কিনা খবর এলো যে প্র্যাকটিসের মাঠে হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে নন্দর ঠ্যাং গেছে ভেঙে, পনেরো দিনের মধ্যেও তার সেরে ওঠবার আশা নেই। হায়, হায়, নন্দ যে এবার সেঞ্চুরি করতো! তাদের আশা-ভরসা বলবুদ্ধি সবই যে ছিলো ঐ নন্দ। কী হবে এখন?

হেডমাষ্টার থেকে আরম্ভ ক'রে দরোয়ান পর্য্যন্ত সকলেই সমান বিচলিত। ছেলেরা তো কাঁদো-কাঁদো। খেলোয়াড়রা ধরে নিয়েছে এটা ঐ রাণী ভবানীরই কোনো ছেলের কাণ্ড, যদিও তাদের মাঠের ত্রিসীমানাতেও রাণী ভবানীর কোনো ছেলে ছিলো না। তাতে কী? নন্দর ঠ্যাং ভাঙলে ওদেরই জিৎ, সুতরাং ওরাই এটা করেছে। চক্রান্ত চলেছে ওদের কাপ্তেনের হাতের কব্জি এমনভাবে ভেঙে দেওয়া যাতে জন্মেও আর ব্যাট ধরতে না হয়। হেডমাষ্টার সেটা জানতে পেরে খেলোয়াড়দের একত্র ক'রে, ভালো-ভালো উপদেশ দিচ্ছেন—ক্রিকেট হচ্ছে ক্রিকেট, মানে এতে খেলা জেতবার চাইতে ভদ্রভাবে ভালো ক'রে খেলাটাই বড়ো কথা।

তা ছেলেরা কি অত সব শোনে! অত সাধের বীরেশ্বরী কাপ্‌ তাদের! এদিকে খেলার আর মোটে একদিন বাকি!

এত সব ব্যাপারের মধ্যেও সুপতি ছিলো উদাসীন হ'য়ে। কিছুই যেন

তার গায়ে লাগে না। দেখে-দেখে বিধুর শরীরটা জ্ব'লে যায়। বিধু নিজে খেলে না, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে তার সব চেয়ে বেশি উৎসাহ। টিফিনের সময় যখন সে দেখলে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সুপতি লম্বা

হেড্ মাষ্টার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেল্লেন......

কোঁচা ঝুলিয়ে একটা-একটা করে খোসা ছাড়িয়ে চীনেবাদাম খাচ্ছে তখন তার আর সহ্য হ'লো না। ছু'টে গিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি খুব নিশ্চিন্ত!'

'কেন, চিন্তিত হবার কী আছে?'

'নন্দর ঠ্যাং ভেঙেছে খবর রাখো? আমাদের এত বড়ো একটা ম্যাচ—'

'তা খেলা বুঝি হবে না?'

'খেলা তো হ'তেই হবে, কিন্তু নন্দকে না-হ'লে আবার খেলা কিসের! ইস্—বীরেশ্বরী কাপ এবার আমাদের কে মারে!'

'এর জন্যে এত ভাবছো কেন? আমি খেলবো, তাহ'লেই হবে' ব'লে সুপতি কুড়মুড় ক'রে একটা চীনেবাদাম ভাঙতে লাগলো।

বিধু তো হাঁ। খানিকক্ষণ কথাই নেই তার মুখে।

সুপতি আবার বলে, 'আমি খেলবো, তা হ'লেই হবে। ভেবো না তোমরা।'

'তুমি—খেলতে পারো?'

সুপতি মুচকি হাসলো।

'পারি একটু একটু। বম্বেতে ছিলুম কিনা, ক্রিকেট তো সেখানেই খেলা হয়! যা হয়—সে তো ছেলেখেলা।'

এ-কথা শুনে বিধুর দস্তুরমতো মাথা ঘুরে গেলো। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে সুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'এ-কথা তুমি আগে বলোনি কেন?'

'ওঃ, এ আর একটা বলবার কী?' খুব তাচ্ছিল্যের সুরে বললে সুপতি।

কিন্তু বিধু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'তাহ'লে আর দেরি নয়। চলো পীতাম্বরবাবুর কাছে এক্ষুনি!'

সুপতি দু'পা পিছু হটে বললে, 'পাগল!'

'সে কী কথা! তোমাকে যে খেলতেই হবে। না—না, তোমার কোনো কথা শুনবো না, তুমি যে একজন অসাধারণ খেলোয়াড় তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো কথাটা। চলো, চলো,' ব'লে বিধু সুপতির হাত ধরলো।

আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুপতি বললে: 'আসল কথাটা তাহ'লে বলি তোমাকে। আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি ম্যাট্রিক পাশ না-ক'রে আর ব্যাট ধরবো না।'

'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ। খেলা নিয়ে বড্ড মেতে থাকতুম ব'লে বাবা প্রায়ই বকতেন। শেষটায় একদিন এমন রাগ হ'লো যে—'

'তাই ব'লে খেলা ছেড়ে দিলে?'

'তাতে আর কী? এখন পড়াশুনোয় মন দিয়েছি। না ভাই, তোমরা আমাকে মাপ করো।'

'ক্ষেপেছো? কাল তোমাকে খেলতেই হবে। শুনতে পেলে হেডমাষ্টার মশাই-ই ছাড়বেন নাকি ভেবেছো? আমাদের ইস্কুলের মান-সম্মান এখন যে তোমারই হাতে।' উৎসাহের ঝোঁকে বিধুর মুখ দিয়ে বক্তৃতার ভাষা বেরুতে লাগলো। 'আমাদের এত বড়ো একটা বিপদ—আর তার কাছে তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা! উঃ ঐ রাণী ভবানীর ষণ্ডারা তো কাল নাচতে-নাচতে আসবে। নন্দ খেলছে না, তাহলে আর ভাবনা কী? কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখবে ওরা বম্বের খেলা! ওঃ, গ্র্যাণ্ড হবে! ওদের পিটিয়ে একেবারে ফ্ল্যাট ক'রে দেওয়া চাই কিন্তু, ব'লে বিধু সুপতির পিঠের উপর এমন চড় মারলে যে সুপতি আর একটু হ'লেই 'উঃ,' ব'লে ফেলেছিলো।

বিধুর উৎসাহ একবার যখন ভালো ক'রে জেগে ওঠে তখন আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। টানতে-টানতে সে সুপতিকে নিয়ে তক্ষুনি হাজির করলো পীতাম্বরবাবুর কাছে। বললে, 'এই তো, স্যর, খেলোয়াড় ধরে এনেছি, আর ভাবনা নেই। সুপতি বম্বেতে সব ভালো-ভালো ম্যাচে লম্বা স্কোর ক'রে এসেছে, অথচ আমাদের কাছে কিচ্ছুই বলেনি। দেখুন তো, স্যর, কী অন্যায়!'

সুপতি বলতে আরম্ভ করলো, 'আমার অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই—'

কিন্তু কে শোনে ওর কথা! বিধু গড় গড় করে বলতে লাগলো, এ-সব ওর বাজে কথা, স্যার। চমৎকার ব্যাট্‌স্‌ম্যান, চেহারা দেখেই তো বোঝা যায়। ওঃ' রাণী ভবানী যা জব্দটা হবে!'

পীতাম্বরবাবু বললেন, 'বিনয় ভালো, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে গোপন করাও অন্যায় এ-কথা আমি বলবোই। সুপতি, তোমার অনেক আগেই টিমে ভর্ত্তি হওয়া উচিত ছিলো। যাক্, কাল খুব ফুর্ত্তিসে খেলে এসো তো। এখন আমার মনে হচ্ছে যে বীরেশ্বরী কাপটা এবার আমরাই নেব।'

নন্দর বদলে ক্যাপ্টেন হয়েছে শঙ্কর, সে বোলার, খুব যে ভালো খেলে তা নয়, তবে চেষ্টা আছে আপ্রাণ। তক্ষুনি তাকে ডাকা হ'লো, গেলো সকলে মিলে হেডমাষ্টারের কাছে, হেডমাষ্টার তো সুপতির হাত ধ'রে ঝাঁকুনিই দিয়ে ফেললেন। ঠিক হ'লো, সুপতি হবে তিন নম্বর খেলোয়াড়, প্রথমে যাবে সুবোধ আর অশোক, ওদের একজন আউট হ'লে অবতীর্ণ হবে ষ্টার একাডেমির ব্র্যাডম্যান।

খবরটা তক্ষুনি সমস্ত স্কুলে ছড়িয়ে পড়লো। বিধু সগর্বে ঘুরে-ঘুরে ব'লে বেড়াতে লাগলো, আমি বলিনি প্রথমেই, ঐ চীনে চেহারার মধ্যে কিছু আছে!' খেলোয়াড়রা উৎসাহে লাফাতে লাগলো, বেচারা ঠ্যাং-ভাঙ্গা নন্দকে তখনকার মত ভুলেই গেলো সকলে। শুধু বিষ্টুটা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'ওরে বাবারে খোদ বোম্বাই ক্রিকেট, চালাকি নয়!' আর অমূল্য ফ্যা-ফ্যা ক'রে হেসে উঠলো।

২

এদিকে হয়েছে কী, সুপতি তো জন্মেও ব্যাট ধরেনি। নিছক একটা কথার কথা ব'লে সে এমন বিপদে পড়বে কে জানতো! নিজেকে দোষ দেবার কথা তার একবারও মনে হ'লো না—ঐ ফোঁপর দালাল বিধুটাই তো যত নষ্টের গোড়া। আরে একটা কথা বলেছি ব'লে তক্ষুনি তা-ই করতে হবে নাকি? তার চাইতে বোবা হ'য়ে থাকলেই হয়। বাড়ি ফিরে এসে সুপতি না পারে খেতে, না পারে একটু আরাম করে বসতে। যে-খেলার মস্কো করতে গিয়েই নন্দর মত পাকা

খেলোয়াড়ের ঠ্যাং ভাঙে, তারই আসলটাতে তার একখানা হাড়ও যে আস্ত থাকবে না সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ রইলো না। যাবে নাকি সে পালিয়ে আজ রাত্রেই হাজারিবাগ কি কটক কি কক্সবাজার যেখানে হয়। ফিরে এসে বললেই হবে হঠাৎ মামার টেলিগ্রাম পেলুম, শিকার করতে গিয়ে তিনি বাঘের হাতে জখম হয়েছিলেন—ওঃ, আস্ত একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ঠিক সময় বুঝে মাস্‌ল্‌ ফুলিয়েছিলেন ব'লেই বেঁচে গেছেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে ছেলেদের মুখের ভাব কেমন হবে সেটা ভেবে ওরই মধ্যে সুপতির মনে একটু আনন্দ হ'লো।

রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখলো ভারি অদ্ভুত। মস্ত মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, চারদিকে হাজার-হাজার লোক। সে নেমেছে ব্যাট হাতে নিয়ে, কিন্তু প্রথম বল্‌টা এসেই যেন তার মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। তারপর বলের বদলে তার মাথা নিয়েই খেলা চললো; তার মাথা মাঠে গড়াচ্ছে, তার মাথা বোঁ-বোঁ ক'রে শূন্যে উড়ছে, আর চারদিকে লোকের কী হাততালি!

সকালে উঠেই সে মন ঠিক ক'রে ফেললো। আজকের মতো সে যাবে তো শিবপুরে পালিয়ে—সেখানে তার এক পিসী থাকেন। উপস্থিত ফাঁড়া কাটুক তো, তারপর উপস্থিত বুদ্ধিমত যা মুখে আসে বলা যাবে।

যথাসাধ্য পেট ভরে রুটি-মাখন আর চা খেয়ে, একখানা কাপড় ভাঁজ করে খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়ে সে কেবল বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় বিধু আর শঙ্কর দু'দিক থেকে এসে তার দু' হাত ধরলো। পলকের জন্য সুপতির মুখ শুকিয়ে গেলো—ওৎ পেতে ছিলো নাকি ওরা?

বিধু বললে—'এত সকালেই কোথায় বেরুচ্ছো?'

সুপতি চট্‌ ক'রে বললে—'যাচ্ছিলুম ভাই একটু সাঁতরাতে পদ্মপুকুরে।'

বললে শঙ্কর—'রোজই সাঁতার কাটো বুঝি?'

'তা না-হ'লে স্বাস্থ্য হবে কেন?' মুচকি একটু হাসলো সুপতি। 'বেশ, বেশ,' বিধু তার হাত ধ'রে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলে। 'এগারোটায় খেলা আরম্ভ মনে আছে তো? দশটার মধ্যে যাওয়া চাই তোমার।'

'তা দেরি আছে তো এখনো।'

'দেরি আর বেশি কী? চলো তোমার সঙ্গে যাই পদ্মপুকুরে, তোমার সাঁৎরানো দেখি! তারপর একসঙ্গেই যাবো মাঠে। তোমাকে না দেখলে ওদের উৎসাহই হবে না।'

সুপতি ব'লে উঠলো: 'ঐ যাঃ! সেদিন বুকে কি-রকম একটা ব্যথা হ'লো, ডাক্তার বারণ করেছিলো কয়েকদিন সাঁতার কাটতে। ভুলেই গিয়েছিলুম।'

বিধু তাড়াতাড়ি বললে, 'তাহলে আজ থাক্ ভাই, ও-সব সাঁতার টাতার এখন নাই কাটলে।'

শঙ্কর বললে, 'হ্যাঁ, খেলার আগে আবার তোমারও—'

'পাগল!' সুপতি হেসে উঠলো, 'ডাক্তাররা তো ও-রকম কতই বলে। সব মেনে চলতে গেলেই হয়েছিলো!'

কিন্তু ওরা তাকে সাঁৎরাতে যেতে দেবেই না। অগত্যা সুপতি বললে— 'চলো তাহলে আমার ঘরে গিয়েই একটু বসি।'

'ঐ কাগজে জড়ানো ওটা সুইমিং কষ্টুম বুঝি?'

'হ্যাঁ। তা চলো তাহ'লে একটু বসি গিয়ে।'

ওর ঘরে ব'সে শঙ্কর আর বিধু রাজ্যের খেলার গল্প জুড়ে দিলে। সুপতি এমনভাবে তাতে যোগ দিলে যেন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো জিনিসেই তার মন নেই। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার শরীরটা থেকে-থেকেই এমন বিশ্রীভাবে কেঁপে উঠছিলো যেন এক্ষুনি একশো তিন ডিগ্রী জ্বর আসবে। আর উপায় নেই।

৩

খেলা আরম্ভ হয়েছে। ষ্টার একাডেমি টস্-এ জিতেছে, সুবোধ আর অশোক গেছে ব্যাট হাতে নিয়ে। ভিড় মন্দ হয়নি, তুই ইস্কুলের ছেলেরা মাষ্টার মশাইরা, তাছাড়া বাইরের লোকও কিছু আছে। শীতের রোদ্দুরে ঝকঝকে বেলা।

ষ্টার একাডেমি আরম্ভ করলে ভালো। তু'জনেই টুকটাক পেটাচ্ছে। এগারো দৌড় ক'রে সুবোধ আউট হ'য়ে গেলো। এবার আসবেন ডন্ ব্র্যাডম্যান।

সুপতি যথারীতি সাদা প্যান্ট পরেছে, গলা-খোলা সাদা সার্ট আর কেড্স, দেখাচ্ছিলো তাকে বেশ ভালোই। হাতে দস্তানাও পরলে, কিন্তু প্যাড আঁটবার সময় তার পা তুটো ঠকঠক ক'রে যে কাঁপতে আরম্ভ করলো, সে আর থামেই না। অতি কষ্টে তো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাতে নিলে ব্যাট! বুক তার ধড়ফড় করছে, গলাটা আসছে বুজে, চোখে ভালো ক'রে কিছু দেখছে না।

ঈশ্বরের দয়ায় এক বল্-এই আউট হ'য়ে যায় তাহ'লেই হয়। ঈশ্বরের দয়ায় হাত-পা গুলো আস্ত থাকে তাহ'লেই হয়। ব্যাট দোলাতে-দোলাতে সে তো চললো উইকেটের দিকে, ষ্টার একাডেমির দল উৎসাহে হাত-তালি দিয়ে উঠলো। হাত-তালির শব্দ থামলো, কিন্তু তার কানের কাছে একটা পিঁ—পিঁ— আওয়াজ কিছুতেই থামছে না কেন?

ব্যাটের উপর ঝুঁকে প'ড়ে খুব কায়দা ক'রে তো সে দাঁড়ালো। রেডি? তারপর সুপতি হঠাৎ দেখলো লাল একটা আগুনের গোলা বিত্যুতের বেগে তার দিকে ছুটেছে। চোখ বুজে তু' হাতে ব্যাট তুলে সে প্রাণপণে মারলে বাড়ি। পরমুহূর্তেই হাত-তালির শব্দে তার কানে তালা লেগে গেলো। কী ব্যাপার? বাউণ্ডারি হয়েছে। য়্যাঁ? পিঠ বেয়ে তার দরদর ক'রে ঘাম নামলো। কিন্তু ভাববার সময় নেই, ঐ আসছে আবার আগুনের গোলা। ঠাস্ ক'রে

একটা শব্দ হ'লো, হাত-তালি, চীৎকার, ওরা সব পাগল হ'য়ে গেলো নাকি? ওভার বাউণ্ডারি।' সুপতি চোখে ঝাপসা দেখছিলো, চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে আবার ব্যাট ধ'রে দাঁড়ালো। আবার এলো বল, আবার ওভার বাউণ্ডারি। বাস্‌রে, কী চীৎকার! থামেই না। তার পরের বলটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে একেবারে আকাশে উঠে গেলো। তার মুণ্ডুটাই কি উড়ে গেলো, না, বলটাই আকাশ থেকে পড়ছে, সুপতি তা বুঝতে পারার আগেই একজন খপ্‌ ক'রে সেটা ধরে ফেললো। এবার হাত-তালি উঠলো অন্যদিক থেকে।

য়্যাঁ? আউট? বাঁচা গেছে। কপালের ঘাম মুছে সে ফিরে এলো, তবু কি শান্তি আছে? পীতাম্বরবাবু ঝাঁকাচ্ছেন কাঁধ ধরে, হেডমাষ্টার ঝাঁকাচ্ছেন হাত ধ'রে, আর বিধু তো ফুর্ত্তির চোটে একটা ডিগ্‌বাজিই খেয়ে ফেললো। ওঃ কী ষ্টাইল! স্কোর না-হয় বেশি ওঠেনি, তাতে কী! দৈবাৎ ঐ ক্যাচটা না উঠলে কী হ'তো ভাবো দিকি!

সবশুদ্ধ ষ্টার একাডেমি করলে ষাট; পিছনের খেলোয়াড়রা চটপট প'ড়ে গেলো কিনা। রাণী ভবানীর দল সাতজনে সাতচল্লিশ করলে, কিন্তু তার পরেই বেলা প'ড়ে গেলো, আর খেলা হয় না। কাজে-কাজেই আজকের মত ড্র হ'লো, আবার খেলা হবে।

তিন ঘণ্টা সমানে ফ্যাগ্‌ খেটে সুপতির ততক্ষণে প্রত্যেকটি হাড় যেন খুলে আসছে। এবার সে বাড়ি গিয়ে শুতে পারলে বাঁচে। বল ধরতে গিয়ে হাতে চোট লেগেছে বিস্তর, আছাড় খেয়েছে, বলের পিছনে দৌড়তে-দৌড়তে জিভ বেরিয়ে এসেছে। তবু কি রেহাই আছে! ঐ আবার বিধুটা তাকে পাকড়েছে। আবার খেলা হবে সাতদিন পরে, এ-ক'দিন খুব ক'ষে প্র্যাকটিস করা চাই। সুপতি যদি কয়েকটা দিন ঝালিয়ে নেয় তাহ'লে তার সামনে দাঁড়াতে পারে রাণী ভবানীর কোনো বোলার! চাইকি সামনের ম্যাচে তাকেই ক্যাপ্টেন ক'রে দেওয়া যাবে। আজ অবিশ্যি সে চট্‌ ক'রে আউট হ'য়ে গেলো, কিন্তু সে

যে একজন অসাধারণ খেলোয়াড় তা তো ঠিক। ব্যাট ধরবার কায়দা দেখেলেই তো বোঝা যায়!

৪

পরের দিনই সুপতি ট্রান্সফার নিলে।

হেডমাষ্টার কত বোঝালেন, কত সাধলেন, কিন্তু সুপতি অচল। 'বাবা আমাকে এলাহাবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন স্যর, কলকাতায় স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

এদিকে বিধু তিন-তিনবার তার বাড়ীতে এসে ঘুরে গেলো—সুপতি বাড়ি নেই।

দেয়ালির রাত্রে আলো নিবে গেলে যেমন লাগে, ওদের মনের ভাব অনেকটা সেই রকম হ'য়ে গেলো। শঙ্কর বললে—'নিশ্চয়ই অন্য-কোনো ইস্কুল ভাগিয়ে নিয়েছে। হয়তো রাণী ভবানীই—কে জানে!'

বিধু বল্‌লে—'ইস্, সাহস কত! তাহ'লে রাণী ভবানীরও একখানা ইটও আস্ত রাখবো নাকি? কে জানে বুঝি আবার বম্বেতেই চ'লে গেলো খেলতে।'

শোভন বললে, 'হ্যাঁঃ গেলেই হ'লো কিনা! সামনের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে না!

'আরে ওর আবার পড়াশুনো কী! হয়তো বম্বে থেকে বিলেতেই চ'লে যাবে টেসট্ খেলতে। কে জানে!'

এমন কি বিষ্টু পর্য্যন্ত বললেঃ 'আরে বম্বে গেছে না হাতি! আছে এখানেই একদিন এসে হাজির হবে ঠিক। দাম বাড়াচ্ছেন—বুঝলে না?'

কিন্তু সুপতিকে ওরা কেউ আর দ্যাখেনি। কলকাতায় কি অন্য কোথাও সে আর খেলেছে এমন খবরও পায়নি কেউ। বিধু এখনো অবাক হ'য়ে মাঝে-মাঝে ভাবে—তাইতো! এমন চমৎকার একটা খেলোয়াড়, তার হ'লো কী? তাইতো!
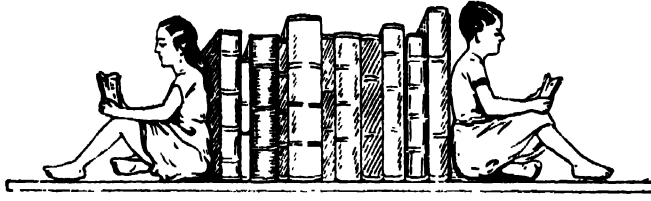
চ ড়ার ব

আমার জীবনে পরম সৌভাগ্য এই যে আই-এ কেলাস থেকে এম্-এ পর্য্যন্ত ঝাড়া ছ' বছর আমি এককড়ি দে-র সহপাঠী ছিলুম। আমার অতি দুঃখের দিনগুলিতে এই আমার একমাত্র সুখ ও শান্তি, গর্ব্ব ও সান্ত্বনা, আশা ও আনন্দ। দেড়শো টাকা মাইনেতে কেরাণীগিরি করি, কলকাতায় তাতে সংসার চলে না। অফিসের সায়েব-গুলি ঘোরতর নাস্তিক—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কোন পরবই মানে না; সরস্বতী পূজোয় অফিস, দোলে অফিস, মহরমে অফিস; ক্রিসমাসে আড়াইদিন ও পূজোর দু'দিন ছুটি—কখনো-কখনো রবিবারেও আধ-পেটা খেয়ে ছুটতে হয়। তার উপর আমি হচ্ছি রোগের একটি প্রদর্শনী। কী চান? দাঁত ব্যথা? আছে। মাথা ধরা? আছে। বদহজম? আছে। হার্টের গোলমাল? তাও আছে। অম্বল? অম্বলে তো ম'রে যাচ্ছি। পিত্তশূল? একবার যখন ব্যথা উঠে, স্বয়ং আপিসের বড়ো সায়েব ডেকে পাঠালেও নড়বার সাধ্য থাকে না। দু'টি ভাত আর গাঁদাল পাতার ঝোল খেয়ে হজম হয় না, এদিকে কিছু খাইনে বলেই ওজন নাকি অবিশ্রান্ত ক'মে যাচ্ছে। রাত্তিরে ঘুম আসে না, ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে—এদিকে আপিসে গিয়ে চেয়ারে যেই বসা অমনি ঘুমে যেন হাড়গোড় শুদ্ধ ভেঙ্গে আসে। দু'দিন যদি হজমটা একটু ভালো হ'লো তো ঘুষ ঘুষে জ্বর ধরলো, জ্বর সারাতে যদি স্নান বন্ধ করলুম অমনি সুরু হ'লো নাক দিয়ে রক্ত পড়া। আমি খেয়ে দেখেছি, না খেয়ে দেখেছি, শেষরাত্রে উঠে লেকে গিয়ে

সাঁৎরেছি, বালিগঞ্জের ময়দানে দৌড়িয়েছি, আবার একেবারে পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে "রেসট্" নিয়েও দেখেছি—কিছুতেই কিছু হয় না। ড়াক্তার? ওষুধ? মাইনের আদ্ধেক তো ওরা নেয়, সে আমার একেবারে বাজেট-করা খরচ! যে-মাসে কিছু কম হ'লো সে-মাসে দস্তুরমত অস্বস্তি লাগে আমার। কত ছোকরা ডাক্তার এক আমারই
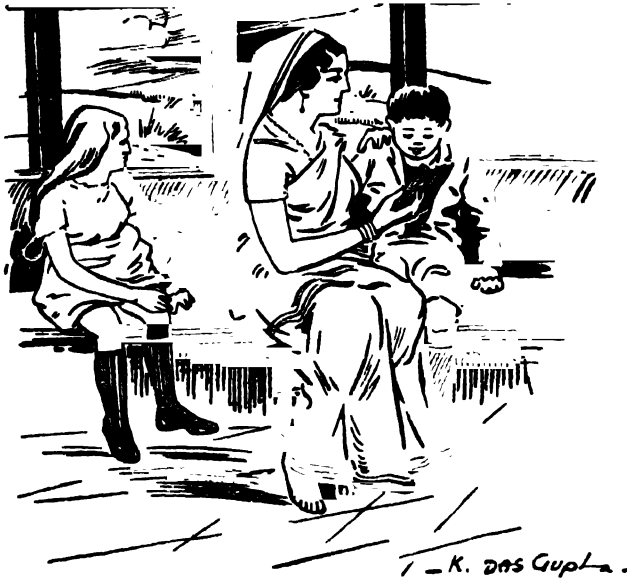
আমি পড়ছি, তোরা শোন……

চিকিৎসা ক'রে-ক'রে একেবারে প্রবীণ বিচক্ষণ হ'য়ে উঠে পসার জমিয়ে ফেললে—আমি যেন একটা রোগের লেড্-ল কোম্পানী—এখানে-ওখানে ঘুরতে হয় না, এক সঙ্গে এক য়ায়গাতেই সব পাওয়া যায়। কানাঘুষো শুনেছি যে, সহরের যে-অঞ্চলে আমার বাসা, সেখানকার ডাক্তারদের মধ্যে আমাকে নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি; বসিয়ে, শুইয়ে, দাঁড় করিয়ে, কাৎ করিয়ে, হাঁ করিয়ে বিভিন্ন বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার বুক

পেট পিট গলা জিব চোখ দাঁত দেখে তাঁরা যা শিখতেন, দু'বছর মেডিকেল কলেজে প'ড়েও নাকি ততটা শেখেন নি।

সবই ছিলো শুধু বাত ছিলো না। এত রোগা শরীরে আবার বাত! কিন্তু যাই বলুন, এটা যেন আমার প্রতি অদৃষ্টের একটা অবিচারই মনে হতো আমার। দস্তুরমত ক্ষুব্ধ বোধ করতুম সময়ে সময়ে। কেমন যেন অপমানিত। সবই আছে এই শরীরে; ঐ বাতই এমন কি বড়মানুষ নবাব এলেন যে আমাকে তাঁর পছন্দ হ'লো না! তবে সুখের বিষয়, এবারকার শীতে বাতকেও বাগিয়েছি। গেঁটো বাত, আঙুলের গিঁটে-গিঁটে বেশ ভালা রকম জায়গা জুড়েছেন। এখন আর আমার আপশোষ নেই।

এ-হেন জীবন নিয়েও যে কোনরকমে বেঁচে আছি তাব একমাত্র কারণই বোধ এককড়ি দে-র সঙ্গে আমার বন্ধুতা। কেননা এই এককড়ি দে হচ্ছেন আমাদের বাঙলাদেশের অন্যতম মন্ত্রী এ, কে, ডে, (খেতাবগুলো বাদ দিয়ে দিলুম।) কী, বড়ো চমকে উঠলেন যে? নাকি মুখ ফিরিয়ে হাসলেন? না, মশাই, একটুও বানিয়ে কি বাড়িয়ে বলছি না—মন্ত্রীবর এ, কে, ডে, সত্যি-সত্যিই আমার সহপাঠী, শুধু সহপাঠী নয়, বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়, একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু। কলেজ থেকে বেরোবাব পর আজ অবধি এককড়ির সঙ্গে আমাদের বন্ধুতা শিথিল তো হয়নি, বরং দিন-দিন গভীর হচ্ছে। ওর এত কাজের ফাঁকে-ফাঁকে প্রায়ই দেখাশোনা গল্পগুজব হ'য়ে থাকে—বিশ্বাস না হয় ওকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন। তা আপনারা জিজ্ঞেসই বা করবেন কী ক'রে—চিঠি লিখে এনগেজমেণ্ট ক'রে তবে তো ওর দেখা পাবেন—কি পাবেন না; আর দেখা হ'লেও দু'মিনিটে চটপট কাজের কথা সেরে উঠতে হবে; আমার মত তো আর রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পর গদি-আঁটা দেওয়া চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পান চিবোতে-চিবোতে খোসগল্প করতে পারেন না আপনারা।

* * * *

আমার এই কথাটা যদি কারো বিশ্বাস না হয় না-ই হ'লো, বিশ্বাস করবার জন্য আমি আদৌ ব্যস্ত নই। কিন্তু আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে একলব্য দেব, যে রোজ

দশটা থেকে ছ'টা লোম্যান অ্যাণ্ড্ লিটলটন কোম্পানীর আপিসে কলম পেষে, এবং যার শরীর একটা রোগের প্রদর্শনী, সেটা অন্তত আপনারা বিশ্বাস করবেন। এ কথাটা এমন করুণ ক'রে বলছি এই জন্যে যে একলার এই অতি পুরানো সত্যটা সম্বন্ধে নিজেই প্রায় সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলুম।

দোষের মধ্যে কতকগুলো পদ্য লিখেছিলুম। আমার এই রোগটার কথা এতক্ষণ কিছু বলি নি, কারণ এর উৎপাত বেশি স্থায়ী হয় না, তা ছাড়া এ-রোগের চিকিৎসাও বহুবছর ধ'রে এমন চমৎকার চলেছে যে এতদিনে ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে বলা যায়। পদ্য লেখার রোগ যাদের আছে, ক্ষীণ উপার্জ্জনে অবসরহীন কেরাণীগিরির মতো চমৎকার চিকিৎসা তাদের আর নেই। আমি তো হাতে-হাতে আশ্চর্য্য ফল পাচ্ছি।

ছাত্রজীবনের শেষ ও কেরাণীজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে কতগুলো পদ্য লিখেছিলুম। ছোটদের জন্যে ছড়া, বিশেষ-কিছু নয়। নিজেরই মনের খুসিতে লেখা, কাউকে খুসি করবার জন্যে নয়। তা ছাড়া বহুদিন পর্য্যন্ত কাউকে খুসি করবার কথাও ওঠেনি। লেখাগুলো একটা ছ'আনা দামের এক্সারসাইজ বুকে পড়েছিলো আমার ট্রাঙ্কের অন্ধকারে; লোম্যান-লিট্‌লটনের সরকারী ও দরকারী চিঠি মক্সো করতে-করতে তাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। আমার হয়তো কখনো মনেও পড়তো না; কিন্তু মনে পড়লো এককড়ির। ছাত্রাবস্থায় সে-সব লেখা কিছু-কিছু তাকে দেখিয়েখিলুম।

আমার কোনো দোষ নেই তা আগেই ব'লে রাখছি। এককড়ি টেনে বার করলো খাতা, তারপর একদিন দেখলুম সে খাতা চমৎকার মলাটে বাঁধা হয়ে ধবধবে কাগজে চকচকে ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। বইখানার নাম হ'লো সাদাসিধে "ছড়ার বই" এবং লেখক আরো বেশি সাদাসিধে একলব্য দেব। অর্থাৎ আমি।

বলা বাহুল্য, সমস্ত খরচ এককড়িই দিলে। আর আমি বইয়ের গোড়ার পৃষ্ঠায় এই উৎসর্গ পত্র লিখে দিলুম—

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত এককড়ি দে-র
পুত্র ও কন্যা
প্রপৌত্র প্রপৌত্রীদের
উপহার

আমি—দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণী—এর বেশি আর কী আমি করতে পারি ?

বইখানা আপনারা অনেকেই হয়তো পড়েছেন। শুনতে পাই "ছড়ার বই" নাকি বাংলাদেশে হাসির ঢেউ তুলে দিয়েছে। সে-ঢেউয়ের কিছু ধাক্কা আমারও গায়ে এসে লাগলো—দস্তুরমত ঝন ঝন শব্দে—যখন তিনমাসেই প্রথম সংস্করণ গেলো ফুরিয়ে। এককড়ি দ্বিতীয় দু' হাজারী সংস্করণ ছাপাতে দিলে।

আশ্চর্য্য! একলব্য দেব প্রায় একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠলো। বই থেকে কিছু-কিছু টাকাও চালান হ'তে লাগলো পকেটে। দস্তুরমত মাথা ঘুরে পড়ে ফিট্ হবার যোগাড়! ঐ রোগটা বোধ হয় ধরবে এবারে।

অন্তত পদ্য লেখার রোগটা আবার দেখা দিলো ঠিকই। আপিসের কাজে একটু ফাঁক পেলে আপিসের কাগজেই দু' লাইন লিখে ফেলতুম। ট্রামে যেতে আসতে নানারকমের মিল মাথার মধ্যে কিলবিল করতো। এমনি ক'রে ক'রে প্রায় আর-একখানা বইয়ের আদ্ধেক যখন লিখে ফেলেছি এমন সময় আমাদের জীবনেও ক্রিস-মাসের ছুটি এলো! আস্ত তিন দিন ছুটি (রবিবার নিয়ে), পর-পর তিনটে দিন, আছো কোথায়।

ভয়ানক একটা দুর্দ্দান্ত শপথ ক'রে ফেললুম, এই ছুটিতে বেড়াতে যাবো। যাবো অবিশ্যি উলুবেড়ে, তা হোক, রেলগাড়িতে চাপবো তো। উলুবেড়েতে আমার এক মামাতো ভাই জমি দিয়ে চাষবাস করছে, মুর্গি-মাছ পালছে, আছে নাকি সুখে। দেখে আসি একবার। এক টাকা দশ পয়সা রিটর্ণ ইণ্টার, থাকা খাওয়ার খরচ নেই, এর চেয়ে সস্তা বেড়ানো আর কি হ'তে পারে?

সত্যি কথা বলবো, সেই লোকাল ট্রেণের ইন্টার ক্লাশ কামরায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে নিজেকে রাজার মতো মনে হচ্ছিলো। কামরায় আর কোনো লোক নেই ; গাড়ি ছেড়ে দিলে ইচ্ছে করলে আমি চেঁচিয়ে গান করতেও পারি।

গাড়ি ছাড়তে আর দু'মিনিট বাকি, এমন সময় ব্যস্তসমস্তভাবে একটি আস্ত পরিবার আমার কামরায় মালপত্র সমেত উঠে পড়লেন। মা ও বাবা, ও দুটি ভাই বোন। দু'জনেই ছোটো। মুহূর্তে সমস্ত কামরাটা যেন ভ'রে উঠলো ; আমি তাড়াতাড়ি ছড়ানো পা সঙ্কুচিত ক'রে বসলুম, যদিও আমার বেঞ্চিতে তাঁরা ভাগ বসাননি।

কোলাহলের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর মালপত্র তাঁরা ঠেসে দিলেন, নিজেরা বসলেন ঠিক হ'য়ে। একা ব'সে-ব'সে আড়চোখে তাঁদের লক্ষ্য না ক'রে আমার উপায় ছিলো না।

খানিক পরেই ছোটো ছেলেটি ব'লে উঠলো, 'মা, আমার সেই বইটা দাও।'

সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েটি ব'লে উঠলো, 'না, আমাকে দাও। আমি পড়বো।'

ছেলেটি ফোঁস ক'রে উঠলো, 'ইস।'

মেয়েটি বললে, 'তুই তো বই ছিঁড়িস, তোর হাতে বই দিতে নেই।'

ছেলেটি বললে, 'কক্ষনো না! ও বই আমার—তোকে আমি ও বই দেবোই না।'

এমন সময় ওদের মা বললেন, 'চুপ কর, তোরা ; আমি পড়ছি, তোরা শোন।'

তাতে দু'জনকেই রাজি দেখা গেলো। ওদের মা তখন ছোটো একটা চামড়ার বাক্স থেকে যে-বইখানা বার করলেন, নাম তার "ছড়ার বই" এবং লেখক তার একলব্য দেব। রোমাঞ্চিত হলুম।

যথাসম্ভব উদাসীনতার ভাণ ক'রে যথাসাধ্য মন দিয়ে পরের ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করতে লাগলুম। মা বেশ চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ছড়াগুলো পড়তে লাগলেন ; আর রেলগাড়ির চাকার শব্দ ছাপিয়েও উঠলো ওদের দু'জনের হাসির রোল। শুধু ছোটোরা নয়—মা নিজে হাসছেন,. এমন কি বাবাও হাসছেন। সমস্ত

কামারাটায় একটা উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, শুধু আমিই চুপ ক'রে, গম্ভীর হ'য়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

একটা ষ্টেশন এলো। পড়া থামিয়ে মা বললেন, 'চমৎকার লিখেছে লোকটা। সত্যি!'

বাবা বললেন, 'এগুলো কার লেখা জানো?'

'এই তো—একলব্য দেব—অদ্ভুত নাম কিন্তু ভদ্রলোকের।'

'তা হলে তো তুমি সবই জানো!' ব'লে চাপা ঠোঁটে হাসতে লাগলেন। 'আসলে এগুলো এ, কে, ডে-এর লেখা—আমাদের মিনিষ্টর এ, কে, ডে।'

তক্ষুনি গাড়ি আবার চলতে সুরু করলো, মহিলাটি কী বললেন ধরতে পারলাম না।

আবার যখন কথা কানে এলো, মহিলাটি বলছেন, 'তুমি জানলে কী ক'রে?

'বাঃ, এতো কলকাতায় সবাই জানে। কাগজেও তো বেরিয়েছে।'

কাগজেও বেরিয়েছে! তা কাগজ তো কতই আছে, আর সে-সব কাগজে কত রকমের কত কথাই বেরোয়! আর ভালো ক'রে একটা কাগজ পড়াবার সময়ও তো আমার নেই। সকলেই জানে, আমিই শুধু জানিনে।

মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলুম; আবার যখন মন দিতে পারলুম, ভদ্রলোকটি বলছেন:

'আশ্চর্য লোক এই দে! এই তো পলিটিক্স নিয়ে আছেন সব সময়, কোন ফাঁকে আবার এগুলো লিখলেন! প্রতিভাবান্!'

মহিলাটি বললেন, 'তবে উনি নিজের নামই দিলেন না কেন?'

'কী যে বলো! অত বড়ো একটা লোক—এ-সব ফাজলেমি লিখলে তাঁর মান থাকে নাকি? তা নাম না দিয়েও তিনি নাম দিয়েছেন বলা যায়।'

'কী রকম?'

'বাঃ—একলব্য দেব সত্যি-সত্যি কারো নাম হতে পারে নাকি? ও যে ছদ্মনাম তা কি কাউকে ব'লে দিতে হয়! ওর পুরো নাম হচ্ছে এককড়ি; এককড়ি আর একলব্যে তফাৎটা কী? আর দে আর দেব তো একই।'

'হুঁ।' মহিলাটির এবার যেন বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে মনে হ'লো। তবে ঐ উৎসর্গটা কেন?' হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এককড়ি দে-র পুত্রকন্যা ও পৌত্রপৌত্রীদের। এটা কি তবে তামাসা!'

'তামাসাও বলতে পারো, বড়লোকের খেয়ালও বলতে পারো। আসলে ওটা লোককে আরো ঘুলিয়ে দেবার একটা কায়দা।'

'কী আশ্চর্য্য! আমি তো জানতুম না এ-কথা!'

'আরে এ নিয়ে তো "নিশান" আর "টিকটিকি" কত লেখালেখি করলে সেদিন। 'আর আমাকেই কি কম তর্ক করতে হয়েছে এ নিয়ে! সেদিন কেষ্ট এসে বলছিলো—সত্যি-সত্যি নাকি একলব্য দেব ব'লে কে একজন আছে—ও নাকি তাকে চেনে, সে আবার একলব্য দেবকে চেনে। "টিকটিকি" থেকে দু' প্যারা শুনিয়ে দিতেই মুখ কালি করে চুপ ক'রে গেল।'

হঠাৎ, এক সেকেণ্ডে, আমি মন স্থির করে ফেললুম। বেঞ্চি থেকে উঠে গেলুম ভদ্রলোকের সামনে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমারই নাম একলব্য দেব, এবং ঐ "ছড়ার বই" খানা আগাগোড়া আমারই লেখা।'

মুহূর্ত্তের জন্য ভদ্রলোক যেন স্তম্ভিত হ'য়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'য়্যাঁ? কী বললেন?'

আমি খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, 'বলছি, একলব্য দেব আমারই নাম। আর ঐ বইখানাও আমারই লেখা।'

ভদ্রলোক হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ।

'ভালো ক'রে আমাকে দেখে রাখুন,' বলতে-বলতে আমি একবার পিছন ফিরে দাঁড়ালুম, 'যাতে পরে কথা উঠলে বলতে প্যারেন যে লোকটাকে দেখেছেন।' তারপর

আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'কেমন ? দেখলেন তো ?'

ভদ্রলোকের চাউনি দেখে মনে হ'লো তিনি আমাকে পাগল ভাবছেন।

'আজ্ঞে না, আমি পাগল নই। লোম্যান-লিটলটনের দফ্তরে কেরানিগিরি করি। খোঁজ নিয়ে জানবেন। আমার বাড়ির ঠিকানা একুশ-সি দীনু সরকার লেন, পদ্মপুকুর নর্থ থেকে বেরিয়েছে। বড়ো বাধিত হই, যদি একদিন দয়া ক'রে আসেন বেলা ন'টার আগে। আরো প্রমাণ যদি চান তো'—বলতে-বলতে পকেট থেকে আমি কতগুলো চিঠি বার করলুম—'এই দেখুন আমার নামের চিঠি ঐ ঠিকানায়—দেখুন না, হাতে নিয়েই দেখুন। আর ঐ ছড়াগুলো আমার লেখা, তার প্রমাণ—' অন্য পকেট থেকে পেন্সিলে লেখা কয়েকটা কাগজ বার করলুম, 'এই দেখুন, ঐরকম ছড়া আরো লিখছি, প'ড়ে দেখুন।'

ভদ্রলোক কাগজটার উপরে একটু চোখ বুলিয়ে আমার হাতে সেটা ফিরিয়ে দিলেন।—'আপনিই তাহ'লে "ছড়ার বই"য়ের ভাগ্যবান লেখক!' অতি কষ্টে তিনি উচ্চারণ করলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমার কথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। 'লেখক বটে, ভাগ্যবান কিনা জানিনে' ব'লে আমি ফের নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ ক'রে বসলুম। একটু পরেই আর একটা ষ্টেশন এলো। এটা কেন করলুম জানিনে কিন্তু তক্ষুনি স্যুটকেসটি হাতে ক'রে কামরা থেকে নেমে পড়লুম—পাশের থার্ড কেলাসটায়, একদল মজুরের মধ্যে ব'সে যেন আরামের হাওয়া লাগলো গায়ে—ওরা কেউ, আর যাই হোক্, 'ছড়ার বই' নিশ্চয়ই পড়েনি।